রবি-পরিক্রমা

রবি-পরিক্রমা

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ.

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব অধ্যাপক

এ. মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ

২, কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

নিবেদন

কাব্যের পরিপূর্ণ পরিচয় বস্তুধ্বনিতে ও রসধ্বনিতে। কিন্তু রসধ্বনি লইয়া কোনো সমালোচনা চলে না। বিশ্লেষণে তাহা পাওয়া যায় না, বুদ্ধি দিয়া তাহার নাগাল পাওয়া যায় না। তাহা অনুভবের সামগ্রী। তবে রসধ্বনিকে মূর্ত্ত করে বস্তুধ্বনি ;—ছন্দ, উপমা, সার্থক শব্দ ও ভাষায় রসধ্বনি মূর্ত্তি পরিগ্রহ কবিতে পারে।

রসধ্বনির ভিত্তিতে একটা জ্ঞান-প্রক্রিয়া থাকে, একটি মর্ম্মকথা বা তত্ত্বদৃষ্টি থাকে। বস্তুধ্বনিতে তাহার খানিকটা ব্যক্ত হয় মাত্র। উহাকে লইয়াই সমালোচকের কারবার। রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাটকের রসধ্বনিকে অনুভূতিগোচব করিতে হইলে,—সত্য ·শিব সুন্দরেব সহিত কবির সম্বন্ধ নির্ণয় কারতে হইলে সমালোচনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথ সেই শ্রেণীর কবি যাঁহার সৃষ্ট ছন্দ উপমা উৎপ্রেক্ষা ভাষা ও শব্দের বাহনে পাঠকচিত্ত রসলোকে উত্তীর্ণ হইযা থাকে।

রবি-পরিক্রমা গ্রন্থে যে কয়টি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইল, তাহাদের মধ্যে কবির তত্ত্বদৃষ্টিকে বস্তুধ্বনি অবলম্বন করিয়া বিশ্লেষণের প্রয়াস আছে। এই গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধ ভারতবর্ষ, দেশ প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় বহু পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকটি নূতন প্রবন্ধও রচনা করিয়া এ বইয়ে দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থখানি রবীন্দ্র-প্রতিভার বা রবীন্দ্রকাব্যনাট্যের ধারাবাহিক কোনো বিশ্লেষণ নহে, রবীন্দ্র-সাহিত্যসাধনার সকল দিকও এ গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই ; গ্রন্থখানিতে অল্প পরিসরের মধ্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বরূপ-সন্ধানের প্রয়াস করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন কাব্যনাটকের মধ্যে কবির কল্পনা ও বর্ণনাভঙ্গির যে বিশেষত্ব বা মৌলিকতা আছে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রপ্রতিভা বিচিত্র এবং বহুমুখী,—সূর্য্যের মতই সে প্রতিভা ভাস্বর। এমন এক প্রতিভাধর কবির সৃষ্টির ঐশ্বর্য্যকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া পাঠকের গোচর করিতে পারিব এমন স্পর্দ্ধা আমার নাই। তাঁহার কাব্য পড়িয়া আমার মনে যে স্পন্দন জাগিয়াছে, রবীন্দ্রসাহিত্যের অধ্যাপনা করিতে করিতে যে অনুভূতি আমার মধ্যে জাগিয়াছে, আমারই চিত্তবিনোদনের জন্ম মাঝে মাঝে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম। এইভাবে ১৩৬০ সালের পঁচিশে বৈশাখ আসন্ন হইল। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া আমার পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করিলেন। অতি অল্প কয়েকদিনের মধ্যে মুদ্রণকার্য্য সমাধা হইয়া বইখানি আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে প্রকাশিত হইল। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে ঐ অসামান্য প্রতিভাবান কবিকে এইভাবে স্মরণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

এক্ষণে, রবীন্দ্রমানসের কিঞ্চিৎ পরিচয়ও যদি রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হন, তবে তাহাকেই আমি আমার চরম পুরস্কার বলিয়া গণ্য করিব।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ — শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

পঁচিশে বৈশাখ: ১৩৬০।

সূচীপত্র

রবি-পরিক্রমা

কৈশোরক পর্য্যায়ের রচনা

[বনফুল ঃ কবিকাহিনী ঃ ভগ্নহৃদয়]

বনফুল, কবিকাহিনী ও ভগ্নহৃদয় রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের রচনা। ১৩৩৮ সালে বিশ্বভারতী হইতে রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁহার কাব্য ও কবিতার যে সঙ্কলন-গ্রন্থখানি 'সঞ্চয়িতা' নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি তাঁহার কৈশোরক পর্য্যায়ে রচিত কোন কবিতাকেই স্থান দেন নাই। অর্থাৎ 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' এবং 'ভগ্নহৃদয়'—এ সকল রচনার কোন অংশই সঞ্চয়িতায় স্থান পায় নাই। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী,' 'প্রভাত-সঙ্গীত'—এমন কি 'ছবি ও গান' হইতে তিনি যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় দুই একটি করিয়া কবিতা সঞ্চয়িতায় স্থান দিয়াছিলেন। কিন্তু 'কড়ি ও কোমল' এবং বিশেষভাবে 'মানসী' ও 'মানসী'র উত্তরকালে রচিত কাব্য হইতে কবি তাঁহার পছন্দমত বহু কবিতা ঐ সঙ্কলনে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। কারণ, কবি তাঁহার কিশোর বয়সে ও অপরিণত যৌবনকালে রচিত কাব্যগুলিকে—বনফুল, কবিকাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীত এবং ছবি ও গানকে অত্যন্ত অপরিণত সৃষ্টি বলিয়া মনে

করিতেন। সম্ভব হইলে তিনি 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে আরম্ভ করিয়া 'কড়ি ও কোমল' পর্য্যন্ত কাব্যগুলিকেও সঞ্চয়িতা হইতে বাদ দিতেন। কিন্তু কবির কবিত্ববিকাশের ধারাটুকু অনুধাবন করিতে পারা যাইবে না বলিয়া, তিনি যেন নিতান্ত অনিচ্ছায়ই 'মানসী'র পূর্ব্বকালে রচিত কাব্যগুলি হইতে কয়েকটি করিয়া কবিতা ঐ সঙ্কলনে স্থান দিয়াছেন। কবির নিজের মতে, সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে,—'মানসী' হইতেই তাঁহার কবিজীবনের বিকাশ সুরু। তাহার পূর্ব্বেকার সকল রচনা—

"স্খলিত পদে চলতে আরম্ভ করেছে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌঁছয় নি।"

এ সম্বন্ধে সঞ্চয়িতার ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন—

"সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীত ও ছবি ও গান যে এখনো বই আকারে চলচে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ দোষ।······ইতিহাস-রক্ষার খাতিরে এই সঙ্কলনে ঐ তিনটি বইয়ের যে কয়টি লেখা প্রকাশ করা গেল, তা ছাড়া ওদের থেকে আর কোন লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। কড়ি ও কামলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে। কিন্তু সেই পর্ব্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেচে।

"তারপর মানসী থেকে আরম্ভ করে বাকী বইগুলির কবিতায় ভালোমন্দ মাঝারির ভেদ আছে, কিন্তু আমার আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম ক'রে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েচে।"

কবি এইরূপ নির্ম্মমভাবে তাঁহার কৈশোরক পর্য্যায়ের কাব্য-গুলিকে উপেক্ষা করিলেও আমরা তাঁহার এই যুগের সৃষ্টিকে উপেক্ষা করিতে পারি না। কারণ, রবীন্দ্রপ্রতিভার উন্মেষ বাস্তবিকপক্ষে ঐ যুগেই হইয়াছিল। কবির কল্পনার মূলসূত্র-গুলির কিছু কিছু সন্ধান তাঁহার কৈশোরক পর্য্যায়ের রচনাতেই পাওয়া যাইতে পারে। সেখানেই তাঁহার বিশিষ্ট কল্পনা ও প্রকাশভঙ্গির বহুতর লক্ষণ দানা বাঁধিয়া রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল। কবির কল্পনাধারার বিকাশ বুঝিবার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক পর্য্যায়ের রচনাবলী উপেক্ষার জিনিস নয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার অন্যতম বিশিষ্টতা বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একটা অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তাবোধ। চিরশ্যাম ধরণীর নিগূঢ় প্রাণস্পন্দন কবির চিত্তকে আকৈশোর আকর্ষণ করিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মিলনের অনুভূতিতে তাঁহার অন্তরের আনন্দোচ্ছ্বাস শতধারায় তাঁহার কবিতার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি হইতে দূরে গিয়া, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত বিচ্ছেদে তিনি বেদনা বোধ করিয়াছেন। ছেলেবেলায় খড়ির গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মিলনলোলুপ কবির অবরুদ্ধ অন্তরাত্মা বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। কিন্তু প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিলে তাঁহার অন্তর আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিত। খড়ির গণ্ডির শাসন কাটাইয়া রবীন্দ্রনাথ যখন একবার তাঁহার শৈশবকালে সর্ব্বপ্রথম বাহিরে যাত্রা করিয়া পেনেটির গঙ্গার ধারে বাস করেন, তখনকার

আনন্দানুভূতি ও উল্লাস তিনি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন পূর্ব্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল।......গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইল। পাল-তোলা নৌকায় আমার মন যখন-তখন বিনা ভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যে-সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত, ভূগোলে আজ পর্য্যন্ত তাহাদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।"

পরবর্ত্তী কালে প্রভাত-সঙ্গীতের 'পুনর্মিলন' শীর্ষক কবিতায় এই শৈশবস্মৃতিই প্রকাশ পাইয়াছে—

আরেকটি ছোট ঘর মনে পড়ে নদীকূলে,
সম্মুখে পেয়ারা গাছ ভরে আছে ফলে-ফুলে।
বসিয়া ছায়াতে তারি ভুলিয়া শৈশবখেলা,
জাহ্নবী প্রবাহপানে চেয়ে আছি সারাবেলা।
সাধ যেত যাই ভেসে
কত রাজ্য কত দেশে,
দুলায়ে দুলায়ে ঢেউ নিয়ে যাবে কত দূর। —পুনর্মিলন

জলস্থল আকাশের সহিত এমনিতর একটা নিবিড় আত্মীয়তাবোধ এবং নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির সর্ব্বত্র বিস্তৃত করিয়া বিলাইয়া দিবার ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রকৃতি-বিষয়ক কবিতায় বারংবারই অভিব্যক্ত হইয়াছে—

নূতন দেশের নাম যত পাঠ করি,
বিচিত্র বর্ণনা শুনি, চিত্ত অগ্রসরি'
সমস্ত স্পর্শিতে চাহে।—

—বসুন্ধরা

এবং—

ইচ্ছা করে, আপনার করি
যেখানে যা-কিছু আছে।······
···························
ইচ্ছা করে মনে মনে,
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোকসনে
দেশ-দেশান্তরে। —বসুন্ধরা

প্রকৃতির সহিত এইরূপ একটা নিবিড় আত্মীয়তাবোধের অনুভূতি হইতেই প্রকৃতির রূপরস গন্ধস্পর্শ উপভোগের ব্যাকুলতা রবীন্দ্রকাব্যে বারংবার ঝঙ্কৃত হইয়াছে। পূরবী বনবাণীর যুগেও এই ধরণের অনুভূতি আছে। ইহাই রোমান্টিসিজ্‌মের—Interpenetrative affinity between man and nature—প্রকৃতির সহিত একাত্মতাবোধ।

এই বিশিষ্ট কল্পনাভঙ্গি—এই ধরণের রোমান্টিক কবি-কল্পনার বিকাশ আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য বনফুলের মধ্যে পাইয়াছি। কবিমানসের উপর বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ় প্রভাব তাঁহার প্রতিভা-উন্মেষের কালেই গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত যে একাত্মতাবোধ ইউরোপীয় রোমান্টিসিজ্‌মকে একটি বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করিয়া ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের অতুলনীয় সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছে, রোমান্টিক যুগের ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের সেই বিশেষ আদর্শটি রবীন্দ্র-নাথের কৈশোরক পর্য্যায়ের কাব্যেই ফুটিতে সুরু করিয়াছিল। তাই দেখা যায় যে, তাঁহার বনফুল কাব্যের তপোবনলালিতা নায়িকা কমলার সহিত কালিদাসের নাটকবর্ণিত শকুন্তলার

মতোই কাননের তরুলতা পশুপক্ষীর একটা আত্মীয়তা ও নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। তপোবন-প্রকৃতির সহিত আশৈশবের বন্ধন ছিন্ন করিতে গিয়া কমলার অন্তর ব্যথায় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে।—

দিনকর নিশাকর গ্রহ-তারা চরাচর
সকলের কাছে আমি লইব বিদায়।
গিরিরাজ হিমালয় ধবল তুষারচয়,
অয়ি গো কাঞ্চনশৃঙ্গ মেঘ-আবরণ!
অয়ি নির্ঝরিণী-মালা, স্রোতস্বিনী শৈলবালা,
অয়ি উপত্যকে, অয়ি হিমশৈল বন,
আজি তোমাদের কাছে মুমূর্ষু বিদায় যাচে—
আজি তোমাদের কাছে অন্তিম বিদায়। —বনফুল

পরবর্ত্তী কালে কড়ি ও কোমলের 'প্রাণ' শীর্ষক কবিতায়, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের মধ্যে, 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'যেতে নাহি দিব' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে পৃথিবীর প্রতি কবির ঠিক এইরূপ একটি গভীর আসক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

বনফুলের কাহিনীর উপর শকুন্তলা নাটকের ও শেক্স-পীয়ারের টেম্পেষ্ট নাটকের প্রভাব আছে। কল্পনাভঙ্গির উপর ইউরোপীয় রোমান্টিসিজ্‌মের প্রভাব আছে।

অতি কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অসীমের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার বালককালের রচনা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিণত সৃষ্টির মধ্যে পর্য্যন্ত অসীম বিশ্বপ্রকৃতির শোভাসৌন্দর্য্যের ভিতরে নিজেকে নিমজ্জিত

করিয়া দিবার ব্যাকুল বাসনা তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বনফুল, কবিকাহিনী প্রভৃতি কাব্যের মধ্যে কবি দেখাইয়াছেন যে, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানব-সম্বন্ধ কত নিবিড়—কত ঘনিষ্ঠ।

নির্ঝরের গতিশীলতা কবির অন্তরে এই যুগেই চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিয়াছে—তাঁহার প্রতিভা-নির্ঝরিণীকে যেন সীমার বাঁধন ভাঙ্গিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে বাধাবন্ধহারা হইয়া তাহারই মতো ছুটিয়া চলিবার আহ্বান জানাইয়াছে।—

ঝর্ঝরে নির্ঝর ছুটে শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গে উঠে
দিগন্ত সীমায় গিয়া যেন অবসান! —বনফুল

কবির প্রতিভা-নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের যে আয়োজন, তাহা যেন এই যুগেই সুরু হইয়াছিল। সীমার সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া নির্ঝর যেমন অসীমের বুকে গিয়া আত্মসমর্পণ করিবার আনন্দে উচ্ছলিত আবেগে সম্মুখপানে ছুটিয়া চলে, রবীন্দ্রনাথের সীমাবদ্ধ মনও তেমনি অসীমের সহিত মিলনের জন্য অধীরতা প্রকাশ করিতে সুরু করিয়াছে এই যুগ হইতেই।

বনফুলের নায়িকা কমলা বিশ্বপ্রকৃতির অসীমতার মধ্যে ফিরিয়া যাইবার বাসনা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে—

আয় তবে ফিরে যাই বিজন শিখরে,
নির্ঝর ঢালিছে যেথা স্ফটিকের জল,
তটিনী বহিছে যেথা কলকল স্বরে
সুবাস নিঃশ্বাস ফেলে বন-ফুলদল। —বনফুল

ইহা কবিরই নিজের অন্তর-বাসনা। কবিকাহিনীর

কিশোর কবিও অসীমের সংস্পর্শে আসিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।—

প্রফুল্ল ঊষার ভূষা তরুণ কিরণে,
বিমল সরসী যবে হত তারাময়ী,
ধরিতে কিরণগুলি হইত অধীর।
যখনি গো নিশীথের শিশিরাশ্রুজলে
ফেলিতেন ঊষাদেবী সুরভি-নিঃশ্বাস,
গাছপালা লতিকার পাতা নড়াইয়া,
ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া ঘুমন্ত নদীর,
যখনি গাহিত বায়ু বন্য গান তার,
তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে,
দেখিত ধানের শীষ দুলিছে পবনে।
দেখিত একাকী বসি' গাছের তলায়,
স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
উঠিছেন ঊষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া।
—কবিকাহিনী

কবিকাহিনীতে প্রকৃতির সহিত কবির পরিচয় নিবিড়তর হইয়াছে। বনফুলে প্রকৃতির সহিত কবির যে পরিচয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটা বিস্ময় আছে—দূর হইতে সম্ভ্রমভরে সেখানে তিনি প্রকৃতির রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং স্তম্ভিত কবিচিত্ত বিশ্বপ্রকৃতির সেই রূপের শুধুমাত্র আরতি করিয়াছে। বনফুলে তিনি বলিয়াছেন যে, বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত প্রসারতায়—

মানুষ বিস্ময়ে ভয়ে দেখে রয় স্তব্ধ হয়ে,
অবাক হইয়া যায় সীমাবদ্ধ মন। —বনফুল

কিন্তু কবিকাহিনীতে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মিলনে কবির অন্তর আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে এবং কবিহৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আনন্দ যেন শতধারায় উৎসারিত হইয়াছে। কবিকাহিনীতে রবীন্দ্রনাথেরই আত্মজীবনী যেন ভাষা পাইয়াছে। সেখানে দেখি, ঐ কাব্যের নায়ক কবি—

জননীর কোল হতে পালাত ছুটিয়া
প্রকৃতির কোলে গিয়া করিত সে খেলা।
ধরিত সে প্রজাপতি, তুলিত সে ফুল,
বসিত সে তরুতলে, শিশিরের ধারা
ধীরে ধীরে দেহে তার পড়িত ঝরিয়া।
—কবিকাহিনী

যে কবির নিকট তাঁহার পরিণতবয়সে বিশ্বপ্রকৃতির ভাষা অতি পরিচিত ও গভীর অর্থভরা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, এই কৈশোরক পর্য্যায়ের কাব্য কবিকাহিনীতেও প্রকৃতির ভাষা তাঁহার নিকট অতি পরিচিত বলিয়াই মনে হইয়াছে। সোনার তরীর যুগে সমুদ্রের তীরে বসিয়া কবি আদিজননী সিন্ধুর আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার ভাষা বুঝিয়াছেন।—উৎসর্গ রচনার যুগে তারায় তারায় যে-ভাষায় কানাকানি হয় তাহা তিনি বুঝিয়াছেন।—কবিকাহিনীর যুগেও প্রকৃতির ভাষা তিনি বুঝিয়াছেন, প্রভাত-সমীরণের ভাষা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন।—

প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত
নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল,
কহিত প্রকৃতি দেবী তার কানে কানে,

প্রভাতের সমীরণ যথা চুপি চুপি
কহে কুসুমের কানে মরম-বারতা।
—কবিকাহিনী

কবির ধর্ম্ম কি এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা তাঁহার কৈশোরেই গঠিত হইয়াছিল। কবিমানস যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া ক্রমাগত সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমকে পাইতে চাহে একথা কবিকাহিনীতেও প্রকাশ পাইয়াছে।—

স্বাধীন বিহঙ্গ-সম কবিদের তরে, দেবী,
পৃথিবীর কারাগার যোগ্য নহে কভু।
অমন সমুদ্র-সম আছে যাহাদের মন,
তাহাদের তরে, দেবী, নহে এ পৃথিবী।
তাদের উদার মন আকাশে উড়িতে চায়,
পিঞ্জরে ঠেকিয়া পক্ষ নিম্নে পড়ে পুনঃ।
নিরাশায় অবশেষে ভেঙে চুরে যায় মন,
জগৎ পূরায় তারা আকুল বিলাপে। —কবিকাহিনী

অজানা সুদূরের প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ-বোধ রোমান্টিক কবিকল্পনার বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পরিণত বয়সের বহু কাব্যে নাটকে এই বিশিষ্ট রোমান্টিক কল্পনাভঙ্গির বিকাশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

কবির কিশোর বয়সে রচিত ভগ্নহৃদয়ের মধ্যেও আমরা দেখি যে, বিশ্বপ্রকৃতি কবির কাছে অসীমের আহ্বান আনিয়া দিয়াছে। কবি সেই অসীমের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন।—

প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ মাঝারে,
মহা উচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে !
মনের এ রুদ্ধ স্রোত দেহখানা করি' বিদারিত
সমস্ত জগৎ যেন চাহে সখী করিতে প্লাবিত।
অনন্ত আকাশ যদি হত এ মনের ক্রীড়াস্থল,
অগণ্য তারকারাশি হত তার খেলনা কেবল,
চৌদিকে দিগন্ত আসি রুধিত না অনন্ত আকাশ,
প্রকৃতি জননী নিজে পড়াত কালের ইতিহাস,
দুরন্ত এ মন-শিশু প্রকৃতির স্তন্য পান করি'
আনন্দ সঙ্গীত-স্রোতে ফেলিত গো শূন্যতল ভরি'।

—ভগ্নহৃদয়

কিশোর কবির অন্তরে যে অনুভূতি তরঙ্গিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী কালে রচিত সমস্ত কাব্যেই কবির অন্তরের সেই গতিবেগ স্রোত হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।—

জগৎ-স্রোতে ভেসে চল, যে যেথা আছ ভাই।
চলেছে যেথা রবি শশী চলরে সেথা যাই।

—স্রোত (প্রভাত-সঙ্গীত)

রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক পর্য্যায়ের কাব্যসমূহে শুধু যে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাঁহার নিবিড় পরিচয় ও সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তাহা নহে। এই যুগে তিনি সভ্যতা-নাগিনীর জ্বালাময়ী রূপকেও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।—

সামান্য নিজের স্বার্থ করিতে সাধন,
কত দেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য !
কোটি কোটি মানবের শান্তি-স্বাধীনতা
রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙ্গিয়া।

তবুও মানুষ বলি' গর্ব্ব করে তারা,
তবু তারা সভা বলি' করে অহঙ্কার !

—কবিকাহিনী

এই কিশোর বয়সে রচিত কাব্যসমূহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁহার কল্পনাবিলাস প্রকাশ করেন নাই। এই যুগের কাব্যে আমরা কবির নিকট হইতে শুনিয়াছি—মানবতার গান, সাম্যবাদের গান, আশার সুর। শেলীর মত এক আদর্শ জগৎ তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাই কবিকাহিনীতে তিনি বলিয়াছেন—

কবে, দেব, এ রজনী হবে অবসান ?
স্নান করি' প্রভাতের শিশির-সলিলে,
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী !
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি'।
নাহিক দরিদ্র ধনী অধিপতি প্রজা,
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্য্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, কেহ কারো দাস।

—কবিকাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আশাবাদী কবি। তাই তিনি একথাও বলিয়াছেন যে—

সেদিন আসিবে, গিরি, এখনই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে—

যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানব হৃদয়।

... ...

এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে,
পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
পৃথিবীর সে অবস্থা আসে নি এখনো—
কিন্তু একদিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।

—কবিকাহিনী

কিশোর কবির আশাবাদী কল্পনা এক নিখুঁত সমাজ ও নীতি-ব্যবস্থার উজ্জ্বল ছবি দেখিয়াছে, এক অনবদ্য কল্পলোকের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিকাহিনীতে শেলীর মত এক নবজীবনের স্বপ্নে বিভোর, তাঁহার প্রত্যাশা অসীম। সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই তাঁহার কবিজীবনে বিশ্ব-প্রেমিকতাকে শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছিলেন। বিশ্বপ্রেমের সেই আদর্শও এই কবিকাহিনী কাব্যে খুব স্পষ্ট হইয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা ও বর্ণনাভঙ্গির উপর শেলীর প্রভাব বিলক্ষণ ছিল। শেলীর কল্পনাবিলাস, সমাজ-অসহিষ্ণুতা, তাঁহার শ্রেণীবর্ণশাসনহীন সমাজ-পরিকল্পনা, বাস্তবতার সম্পর্কশূন্য প্রকৃতির প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণ—এ সকলই বনফুল ও কবিকাহিনী কাব্যে আছে। শেলীর ভাবাতিশয্য, সৌন্দর্য্য-তন্ময়তা, রঙের পর রঙ্ বিন্যাস করিয়া একটি আদর্শলোকের চিত্র ফুটাইয়া তোলার চেষ্টা বনফুল, কবিকাহিনীতে পাওয়া যায়।

কিন্তু আবার শেলীর প্রভাব এড়াইয়া কল্পনাকে একটা নিজস্ব বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করার চেষ্টা—তাহারও সুরু এই যুগে।

কবিকাহিনীতে কবির নিজস্ব বিশিষ্ট কল্পনাভঙ্গি কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা আলোচনা করা যাক।

কবিকাহিনীর আখ্যায়িকার মধ্যে দেখা যায় যে, কাব্যের নায়ক এক কবি। সে প্রকৃতির কোলে জন্মিয়াছিল, প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে সে পালিত হইয়াছিল। কিন্তু মানুষের সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন, মানবের স্নেহপ্রেমবর্জ্জিত নিছক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে কবিকাহিনীর নায়ক-কবির অন্তরে এক গভীর অতৃপ্তি জাগিয়া উঠিল। সে আবিষ্কার করিল যে,—মানবসম্পর্কশূন্য প্রকৃতি মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। মানুষ এবং প্রকৃতি লইয়াই জগৎ—এই দুইয়ের কোন একটিকেই ত্যাগ করিয়া মানুষ পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথকে চিরকাল বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানব দুই-ই সমানভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে কবি তাঁহার কবিজীবনে আকৃষ্ট হইয়াছেন সত্য, কিন্তু বারবারই নিছক কল্পনার জাল বুনিয়া হেলাফেলায় কালযাপন করিতে গিয়া তাঁহার মধ্যে এক গভীর অতৃপ্তি জাগিয়াছে। তখন তিনি বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হইবার কামনা প্রকাশ করিয়াছেন। মাঝে মাঝেই প্রকৃতির মধ্যে শান্তি খুঁজিয়া তিনি 'একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে' —সারাদিন বাঁশি বাজাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার

অন্তরে বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। কল্পলোকের 'সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে' বাস করিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি তখন মনুষ্য-সমাজের দৈনন্দিন কুশ্রীতার মাঝখানে, দুঃখ-দৈন্য-পীড়িত মানব-সংসারের মাঝে ফিরিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন।

ইংরাজ কবি শেলীর কল্পনা তাঁহার স্কাইলার্কের মতোই মাটির সহিত—বাস্তব জগতের সহিত, সমস্ত সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া এক আদর্শলোকে পক্ষবিস্তার করিয়াছে। জীবনের দুঃখ-দৈন্য অতৃপ্তি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এক কল্পলোকে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মাঝে প্রয়াণের বাসনা রবীন্দ্রনাথেও জাগিয়াছে। কিন্তু মৃত্তিকার সহিত, মানবসংসারের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া আকাশ-বিহারের প্রবণতা বা শুধুমাত্র বিশ্বপ্রকৃতিকে লইয়া তৃপ্তিলাভ করা রবীন্দ্রনাথে কোনদিন ছিল না—কৈশোরক-পর্য্যায়ের রচনায়ও না। এই কৈশোরক-পর্য্যায়ের কাব্যসমূহে এবং উত্তরকালের বহু রচনাতেই দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের কল্পনা এক চির-অম্লান পরিবর্ত্তনাতীত কল্পলোকে গিয়াছে সত্য, কিন্তু সেখানে কবি অতৃপ্তি বোধ করিয়া সৌন্দর্য্যের সেই আদর্শলোক হইতে বাস্তবজগতের মাঝখানে নামিয়া আসিয়া স্বস্তি বোধ করিয়াছেন।

কৈশোরক-পর্য্যায়ের 'ভগ্নহৃদয়' রচনাটি আখ্যায়িকামূলক কাব্য। রবীন্দ্রনাথ নিজে ইহাকে গীতিকাব্য বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানি নাট্যকাব্য—ইহাতে নাটক ও কাব্যের লক্ষণ মিশ্রিত হইয়া আছে। ভগ্নহৃদয়ে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত

আত্মীয়তাস্থাপনের ব্যাকুলতা বনফুল, কবিকাহিনী কাব্যের মতই রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ নারীকে যে বিশিষ্ট কল্পনায় তাঁহার কাব্য নাটক উপন্যাস প্রভৃতিতে দেখিয়াছেন, তাহার আভাসও কবি-কাহিনীতে রহিয়াছে দেখিতে পাই। রবীন্দ্রসাহিত্যে নারীর দুই রূপ। একজনা—

উর্ব্বশী সুন্দরী—
বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী ;

এই নারী মানুষের কামনা-বাসনাকে জাগাইয়া দেয়, কিন্তু বাসনার শান্তি আনয়ন করে না।—

"গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায় যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে, নীরবে ঝঙ্কারের অপেক্ষায়, যে ঝঙ্কারে বেজে ওঠে সর্ব্ব দেহে-মনে অনির্ব্বচনীয়ের বাণী।"
—দুই বোন

এই শ্রেণীর নারী—

তপোভঙ্গ করি'
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি'
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি'—
দুহাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে আমরা আর এক শ্রেণীর নারীমূর্ত্তি পাই—তাহা হইতেছে নারীর কল্যাণী মূর্ত্তি।—

লক্ষ্মী সে কল্যাণী,—
বিশ্বের জননী তারে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

এই নারী যেন বর্ষা ঋতু—'জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্দ্ধলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে,—দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।'—(দুই বোন) এই নারী—

ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির-স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায় ;
হেমন্তের হেমকান্ত সরল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্ব্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য সুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন-মৃত্যুর
পবিত্র সংগমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

ভগ্নহৃদয়ের মধ্যে ললিতা, মুরলা ও নলিনী—তিনটি নারী-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ললিতা ও মুরলা এই নারীচরিত্র দুইটি দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর নারী। নলিনী প্রথমোক্ত শ্রেণীর নারী। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরিণত বয়সের কাব্যে কবিতায় ও উপন্যাসে এই দুই শ্রেণীর নারীর কথা বলিয়াছেন—তাহাদের প্রকৃতি ও প্রেমের আদর্শ বর্ণনা করিয়াছেন। 'চিত্রা' কাব্যের 'রাত্রে

ও প্রভাতে' কবিতায় নারীর প্রেয়সী রূপ ও দেবীর রূপ উভয়ই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এক নারী বসন্তের চঞ্চল আবেগকে বাহিরে বিকীর্ণ করিয়া দেন—সে নারী প্রেয়সী। অন্য জন বিশ্বকে শিশিরস্নাত করিয়া অন্তরের মাধুর্য্যে ফলবান করিয়া তুলেন—এ নারী কল্যাণী—দেবীরূপিণী। ইনি উদ্ধত বাসনাকে অনন্তের পূজামন্দিরে ফিরাইয়া আনেন। 'রাজা ও রাণী' নাটকের মধ্যে সুমিত্রার ভিতরে তিনি এই কল্যাণী নারীমূর্ত্তির জয়গান করিয়াছেন—এবং দেখাইয়াছেন যে নারীকে কল্যাণের ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কামনা লালসার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেই প্রেমের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়, ট্রাজেডির সূত্রপাত হয়।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এই কিশোর বয়সে রচিত সকল রচনার মধ্যে সর্ব্বত্রই কবিয়ানা ছিল, এমন কথা মনে করিলে আমরা ভুল করিব। কবির কৈশোরক পর্য্যায়ের রচনার স্থানে স্থানে অহেতুক উচ্ছ্বাস আছে, অনাবশ্যক কল্পনাবিলাস আছে, স্বপ্ন রচনা করিবার প্রয়াস আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের বহুতর কল্পনাভঙ্গির উৎস-সন্ধান করিতে হইলে রসিক পাঠক-মাত্রকেই এই বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয়ের অনুশীলন করিতে হইবে। নতুবা রবীন্দ্র-প্রতিভার ও রবীন্দ্র-কল্পনার উদ্ভব, বিকাশের ধারা—এমন কি স্বরূপ পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হইবে না।

সীমা ও অসীম

সমগ্র বৈষ্ণবকাব্যের মধ্যে যেমন ক্রমাগত সীমার বাঁধ ভাঙিয়া অসীমের সহিত মিলিত হইবার ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথে অসীমের আহ্বানে ব্যাকুল হইয়া অসীমের সহিত মিলনের বাসনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু অসীমেব সহিত মিলিত হইবার ব্যাকুলতায় কবি কখনও সীমাকে উপেক্ষা করেন নাই। উপনিষদ বলিয়াছেন—তোমার সীমার বাহিরে যাহা আছে, তাহার পশ্চাতে তোমার চিত্তকে ও চেষ্টাকে প্রসারিত করিও না। কারণ, ব্রহ্ম,—যিনি অনন্ত অসীম অবাঙ্‌মানসগোচর,—তিনি সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া আছেন। সেই পরমসুন্দর আকাশের নীলিমায়, তরুলতা অরণ্য তৃণ-প্রান্তরের শ্যামলিমায়, জগতের পুষ্পপুঞ্জের শোভাসুষমায়, পক্ষীর কলকাকলিতে, নদীর কলতানে সর্ব্বত্রই বিচিত্ররূপে বিলসিত। পৃথিবীর বিচিত্র দৃশ্য গন্ধ গানে তিনি বিরাজিত। উপনিষদের শিক্ষাপুষ্ট কবি তাই সীমা ও অসীমকে একসূত্রে গাঁথিয়া দেখিয়াছেন, অসীমকে সীমার মধ্যেই খুঁজিয়াছেন। ধর্ম্ম বা বন্ধন যেমন মনুষ্যত্বের সম্যক্‌ উদ্বোধন ও পূর্ণ বিকাশের সহায়ক, কবির চোখে সীমাও তদ্রূপ অনন্ত অসীমকে প্রত্যক্ষ করিবার সহায়ক। আনন্দ এবং হৃদয়াবেগ যেমন রূপাশ্রয়ী, অসীম অরূপ অপরূপকেও তেমনি সীমার বাতায়নপথেই

দেখা যায়। সীমা যেমন একদিকে বাঁধে, অন্যদিকে তেমনি অবারিত সৌন্দর্য্য ও আনন্দের মধ্যে মানুষকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। সীমার বন্ধনকে স্বীকৃতি জানাইলে তবেই মানুষেব অসীমের অভিমুখী আকুতি সফল হইয়া উঠিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির প্রতি, সীমার উপর অনুরাগী হইয়া অতি সহজে অসীমের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন। সৃষ্টি কবির নিকট বন্ধন নয়। ছন্দের বন্ধন যেমন ভাবের মুক্তির সূচনা করে, সৃষ্টির সীমাবন্ধনও তেমনি কবির নিকট অসীমের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনে। তাই কবির নিকট সীমার জগৎ মায়া নয়, সত্য। প্রকৃতি কবির চোখে বড় সুন্দর, বিশেষ ব্যঞ্জনাপূর্ণ, সঙ্গীতময়।—'সঙ্গীতময় এ ধরার ধূলি!'

এবং—

'লক্ষ যুগের সঙ্গীতমাখা
সুন্দর ধরাতল!'

প্রকৃতি কবির নিকট সুদূরের প্রিয়তমের বিরহলিপি। তাহা বার বার পাঠ করিয়াও কবিব তৃপ্তি নাই।

অসীমের প্রতি কবির প্রবল আকর্ষণ। কারণ, উহাই জীবনকে গতি দান করে। গতিতেই জীবন—গতিই জীবনের সকল জড়তা দূরীভূত করিয়া জীবনকে নব নব অভিব্যক্তির পথে চালিত করে, জীবনকে নবীনতায় ভরিয়া তোলে। অসীমের আকর্ষণ, গতির উন্মাদনাই যে জীবনে মঙ্গল-আলোক বিকীর্ণ করে, মানবচিত্তকে ভূমার দিকে আগাইয়া লইয়া যায়, কবি ইহা জানিয়াছিলেন। কিন্তু অসীমকে পাইতে তিনি সীমাকে

অস্বীকার করেন নাই। সীমার মধ্য দিয়াই তিনি অসীমকে পাইবার সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল অসীম—অবলম্বন ছিল সীমা।

সীমার মধ্যে অসীমকে পাওয়া যায় না বা দেখা যায় না, এই ভ্রান্তবিশ্বাসে মানুষ অনেক সময়ে বৈরাগ্যসাধনের পথ অবলম্বন করে, বিশ্বকে উপেক্ষা করে, প্রত্যক্ষকে অশ্রদ্ধা করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সকল সৌন্দর্য্যমূর্ত্তির মধ্যে অনন্তস্বরূপের অখিল রসামৃতমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, খণ্ডরূপের মধ্যে অখণ্ডরূপের ভাতি দেখিয়াছেন।

সীমার রন্ধ্রে কবি চিরদিন অসীমের বাঁশিটি বাজিতে শুনিয়াছেন বলিয়াই জাগতিক সুন্দর বস্তুমাত্রেই তাঁহার মনে পরমসুন্দরের, অসীমের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছে। কবির কল্পনা তখন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া বস্তুর অতীত প্রদেশে, অনন্ত অসীমের উদ্দেশে, নিঃসীম সৌন্দর্য্যসাগরের দিকে যাত্রা সুরু করিয়াছে।

খণ্ড প্রেম ও খণ্ড সৌন্দর্য্যকে নিত্যকালের সৌন্দর্য্যের সহিত, অনাদি অসীম প্রেম ও সৌন্দর্য্যের সহিত যুক্ত করিয়া দেখা রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার অন্যতম বিশেষত্ব। প্রেমের ক্ষেত্রে একটি প্রেমের মধ্যে অনন্ত প্রেমস্মৃতিকণা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। একটি ভালবাসার মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াছেন যুগযুগান্তরের সংখ্যাতীত বিরহমিলনের যোগসূত্র। তাই এ যুগের প্রিয়ার উদ্দেশে কবি বলেন—

ওই দেহ পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে,
যেন কত শত পূর্ব্ব জনমের স্মৃতি।
—কড়ি ও কোমল : স্মৃতি

মানসী কাব্যে প্রিয়াব সৌন্দর্য্যভোগ করিতে গিয়া কেবল বর্ত্তমান জীবনের মধ্যে সেই ভোগকে তিনি সীমাবদ্ধ রাখিতে পারেন নাই। একালের প্রেমের অনুভূতিমাঝে সুদূর অতীতকে তিনি প্রভাব বিস্তার করিতে দেখিয়াছেন।

একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমেব স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি।

একটি সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে অনন্ত সৌন্দর্য্যকে দেখিয়া কবি চিরদিনই তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। যে পার্থিব সৌন্দর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করে, তাহার পশ্চাতে তিনি অনন্ত সৌন্দর্য্যেব ইঙ্গিত দেখিতে পান। সীমা অসীমের দূতী হইয়াই কবিব সম্মুখে আসিয়া বারংবার উপস্থিত হইয়াছে।

সমগ্র অনন্ত ঐ নিমেষের মাঝে
একটি বনের মাঝে জুঁই হয়ে ওঠে।
পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে॥

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যসম্ভোগ করিতেও কবি যখন অগ্রসর হন তখনও সেক্ষেত্রে বারংবার বিস্মৃত অতীত এবং অনন্ত অসীম প্রকৃতিসৌন্দর্য্যের উপর তাহার মায়াজাল বিস্তার করে।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কবিকে মুগ্ধ করে,—কারণ সে সৌন্দর্য্যেব সহিত অনন্তের স্মৃতি বিজড়িত। মানুষের মধ্যে প্রেমরূপে এবং প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য্যরূপে অসীম যে নিয়তই আত্মপ্রকাশ

করিতেছে একথা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যসাধনাকালে কোনদিনও বিস্মৃত হন নাই।

অতি কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথের কবিমানস অসীমের আহ্বান শুনিয়াছিল, এবং সেই সময়কার রচনার মধ্যেও মাঝে মাঝে এই অসীমের আহ্বানের সুরটি বাজিয়াছে।

কবি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন,—

"আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনেব পালা'।"

বালক রবীন্দ্রনাথ অনিশ্চিতের আশঙ্কায় 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রের' কঠোর শাসনে খড়ির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন বটে, কিন্তু সেই বয়সেই তাঁহার চিত্ত অসীমের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি একটু ফাঁক পাইলেই বাহিরের জগতের মধ্যে, অসীম আকাশের মাঝে তাঁহার উৎসুক দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিতেন। এসম্বন্ধেও তিনি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—"বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা যেমন খুশি যাওয়া আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আমরা আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইসারায় আমার সঙ্গে খেলা

করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে। কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই।”

বিশ্বপ্রকৃতি কবির কাছে অসীমের আহ্বান আনিয়া পৌঁছাইয়া দিত। আকাশের নক্ষত্ররাজি হইতে কবির কাছে অসীমের আহ্বান আসিত—

নক্ষত্রনিচয় খোলা জানালায়
উঁকি মারিতেছে মুখের পানে,
খুলিয়া মেলিয়া অসংখ্য নয়ন
উঁকি মারিতেছে যেন বে গগন,
জাগিয়া ভাবিয়া দেখিলে তখন
অবশ্য বিজয় উঠিত কাঁপি।

—বনফুল

অসীমের সহিত মিলনের যে বাসনা কিশোর কবির মনে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল উহা তাঁহার পরবর্ত্তী কালের সকল কাব্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। উৎসর্গের ‘আবর্ত্তন’ কবিতায় কবির এই আনন্দ সুপরিস্ফুট—

অসীম সে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হ’তে চায় অসীমের মাঝে হারা।

অতি কিশোর বয়স হইতেই কবি পথিক বেশে ক্রমাগত যাত্রা করিয়া চলিতে চান এবং সকলকে তাঁহার যাত্রা-পথের সঙ্গী রূপে লইয়া তিনি অগ্রসর হইতে চাহেন—

ছুটে আয় তবে,—ছুটে আয় সবে,
অতি দূর দূর যাব,
কোথায় যাইবে ? —কোথায় যাইব !
জানি না আমরা কোথায় যাইব—
সমুখের পথ যেথা ল'য়ে যায়,—

'প্রভাত-সঙ্গীতে' কবি যখন তাঁহার নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন, তখন হইতে অসীমের আহ্বান তাঁহার চিত্তকে খুব বেশি করিয়া আলোড়িত করিয়াছে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' কবির মন ছিল অবরুদ্ধ। তখন অসীমের সহিত তাঁহার সম্পর্ক নিবিড় হয় নাই। সেইজন্য ঐ কাব্যে অসীমের সহিত মিলনের জন্য অবরুদ্ধ অবস্থার ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু 'প্রভাত-সঙ্গীতে' অসীমের সহিত মিলনের আনন্দে কবি উল্লসিত। 'প্রভাত-সঙ্গীতে'র প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে আনন্দের উচ্ছল তরঙ্গ অনুভূত হয়। 'প্রভাত-উৎসব' কবিতায় অসীমের আহ্বানে কবির উন্মুক্ত হৃদয় উন্মত্ত হইয়া অসীমের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। সীমাবদ্ধ কবিমন হঠাৎ অসীমের আভাস অনুভব করিয়া উল্লসিত হইয়া গাহিয়া উঠিয়াছে—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি',
জগৎ আসি' সেথা করিছে কোলাকুলি।

অসীম অনন্তের আহ্বান কবির কানে পৌঁছিয়াছে। তিনি সেই অনন্ত অসীমকে উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন—

আকাশ, এস এস ডাকিছ বুঝি ভাই,
গেছি তো তোরি বুকে আমি তো হেথা নাই।

... ...

আকাশ পারাবার বুঝি হে পার হবে,
আমারে লও তবে, আমারে লও তবে।

মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদিত রবীন্দ্র-কাব্য-গ্রন্থাবলীতে 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র কবিতাগুলির তিনি নামকরণ করিয়াছিলেন 'হৃদয়-অরণ্য'। বাস্তবিক কবির মন তখন অরণ্যের অন্ধকারে বিশ্বপ্রকৃতি ও অসীম হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। কবি নিজেই 'প্রভাত-সঙ্গীতে'র 'পুনর্মিলন' কবিতায় তাঁহার কাব্যসাধনার ইতিহাসের দুইটি বিশিষ্ট যুগের উল্লেখ করিয়াছেন।

হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হনু পথহারা!

ইহা হইতেছে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র যুগ।

ইহার পরে 'হৃদয়-অরণ্য' হইতে কবির 'নিষ্ক্রমণ' হইয়াছে —তিনি 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' করিয়া অসীমের দিকে যাত্রা করিয়াছেন—

আজিকে একটি পাখী পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য-বাহিরে,
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।

ইহা হইতেছে 'প্রভাত-সঙ্গীতে'র যুগ। তখন প্রকাশের আনন্দে কবির মন-প্রাণ বিভোর হইয়া উঠিয়াছে—অসীমের আভাস পাইয়া তখন কবিচিত্ত আনন্দিত। 'প্রভাত-সঙ্গীতে'ই

প্রকৃতপক্ষে অসীমের সহিত কবির মিলন হইয়াছিল। কবির 'কৈশোরক' পর্য্যায়ের রচনায়, অথবা 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' কবির সহিত অসীমের মিলন কখনও হইয়াছে আবার কখনও বা সেই মিলন-ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু 'প্রভাত-সঙ্গীত' ও ইহার পরবর্ত্তী কালে রচিত সমস্ত কাব্যেই কবির অন্তরের গতি-বেগ 'স্রোত' হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে—

জগৎ-স্রোতে ভেসে চল, যে যেথা আছ ভাই।
চলেছে যেথা রবি শশী চল রে সেথা যাই। —স্রোত

'প্রভাত-সঙ্গীতে' 'অনন্ত-জীবন' নামক কবিতাতেও কবির এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।—

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহাব জলরাশি,
চারিদিক হ'তে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি';
পৃথ্বী হ'তে মহাস্রোত ছুটিতেছে অবিরাম
সেই মহাসাগর-উদ্দেশে ;
আমরা মাটির কণা জলস্রোত ঘোলা করি'
অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে,
সাগরে পড়িব অবশেষে!
জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে,
অনন্ত-জীবন মহাদেশ ;
কে জানে হবে কি তাহা শেষ?

অসীমের আকর্ষণেই কবির প্রতিভা-নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছিল। নির্ঝর গিরিগহ্বরে আবদ্ধ ছিল। সেখানে বাহিরের

জগতের আলো-বাতাস প্রবেশ লাভ করিত না। অকস্মাৎ সূর্য্যের আলোকপাতে সেই নির্ঝর প্রবলবেগে বাহির হইয়া পড়িল। আলো-বাতাসের জগতে অপূর্ব্ব ছন্দে ও গানে নৃত্য করিতে করিতে অসীমের উদ্দেশে যাত্রা করিল। ইহা তো কবিরই নিজের কাব্যসাধনার কথা। যতদিন তিনি অসীম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্ধভাবে আপনাতে আপনি আবদ্ধ ছিলেন, ততদিন তাঁহার এক সুগভীর বিষণ্নতা ছিল। এই বিষাদ ও নৈরাশ্যের ভাব কবির 'প্রভাত-সঙ্গীতে'র পূর্ব্ববর্ত্তী সকল কাব্যেই সুপরিস্ফুট। কিন্তু 'প্রভাত-সঙ্গীতে' তাঁহার সেই স্বপ্নদশা ঘুচিয়া গিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন—

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হ'য়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ 'পরে।

এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবি অসীমের ডাক শুনিতে পাইয়াছেন।—

কি জানি কি হ'ল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হ'তে শুনি যেন মহাসাগরের গান!
ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে ডাকে যেন!
আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন!
ওই যে হৃদয় মোর আহ্বান শুনিতে পায়।
কে আসিবি, কে আসিবি, কে তোরা আসিবি আয়!

এখন সীমাবদ্ধ কবিমন সীমার বাঁধন ভাঙ্গিয়া নির্ঝরের মত

অসীমের বুকে নিজেকে বিলীন করিয়া দিবার জন্য উৎসুক। কবি যাত্রা করিবেন অনন্ত-অসীম পথে—

> আমি যাব—আমি যাব—কোথায় সে কোন্ দেশ—
> জগতে ঢালিব প্রাণ গাহিব করুণা গান।
> উদ্বেগ অধীর হিয়া সুদূর সমুদ্রে গিয়া
> সে প্রাণ মিশাব আর সে গান করিব শেষ।

প্রভাত-সঙ্গীতের 'প্রভাত উৎসব' এবং 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এই দুইটি কবিতাতেই কবির অন্তরকে অসীমের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা খুব বেশি করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটিকাতে এই একই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসী ভববন্ধন ছিন্ন করিয়া অসীমকে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছে, সে বলিয়াছে— 'অনন্তের পারাবারে ভাসায়েছি তরী।' কবি নিজেই ঐ নাটিকার ভাবব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

"সন্ন্যাসী লোকালয়কে তুচ্ছ মায়া, অন্ধতার গহ্বর ব'লে সমস্ত ত্যাগ ক'রে দূরে চ'লে গেল। আকাশের রস-বর্ণ-গন্ধ-ছটা সব তার চৈতন্যের থেকে অপসারিত হ'ল। সে আপনাকে আপনার মধ্যে প্রতিসংহার ক'রে অসীমকে পাবার জন্য পণ কর্‌ল। তারপর কোথা থেকে একটি ছোট মেয়ে দেখা দিল; সে নিরাশ্রয় ছিল, সন্ন্যাসী তাকে গুহায় নিয়ে এল। মেয়েটি তাকে ধীরে ধীরে স্নেহের বন্ধনে বাঁধ্‌ল। তখন সন্ন্যাসীর মনে ধিক্কার হ'ল। সে ভাব্‌তে লাগল যে এই তো প্রকৃতি মায়াবিনী দূতী হ'য়ে এম্‌নি ক'রে মেয়েটিকে

পাঠিয়েছে। সে সন্ন্যাসীকে অসীম থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করতে চায়। এই সংগ্রাম যখন চলেছে তখন একদিন সে ক্রোধের বশে মেয়েটিকে ত্যাগ কর্‌ল।—সন্ন্যাসী যত দূরে স'রে যেতে লাগ্‌ল, ততই মেয়েটির ক্রন্দন তার হৃদয়ে এসে ধ্বনিত হ'তে লাগ্‌ল। শেষে মেয়েটি যে বাস্তব, মায়া নয়—তা সে বেদনার আঘাতে বুঝ্‌তে পার্‌ল। মনের এই অবস্থায় সে দূরে দাঁড়িয়ে লোকালয়ের দৃশ্য দেখতে লাগ্‌ল। তার মাধুর্য্যে, মানুষের স্নেহপ্রীতি সম্বন্ধের সরসতায় তার মন ভ'রে উঠল। সে বল্‌লে—ফেলে দিলুম আমার দণ্ড কমণ্ডলু—দূর হ'য়ে যাক্‌ আমার এ সব আয়োজন। সীমাকে বর্জ্জন ক'রে আমি তো কোনো সত্যই পাই নি। একটি ছোট মেয়েকে স্নেহ করতে পেরেছিলুম ব'লেই তো সেই রসের মধ্যে অসীমকে পেয়েছি।—তার বাইরে তো অনন্ত-স্বরূপের প্রকাশ নেই।...

"প্রকৃতির প্রতিশোধে'র প্রতিপাদ্য বিষয়টা বাল্যকালে আমার নানা কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। সীমার সঙ্গে যোগেই অসীমের অসীমত্ব।—সীমার জগৎকে অসীম থেকে বিযুক্ত ক'রে দিয়ে তার মধ্যে বদ্ধ হ'লে সেও ব্যর্থতা।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সীমা ও অসীমের এইরূপ একটি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ স-সীম ও অ-সীমকে গ্রন্থিরূপে সংযুক্ত দেখিয়াছেন। এই ধারণা 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসীর মুখে প্রকাশ পাইয়াছে—

> এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে,
> মিথ্যা হ'য়ে প্রকাশিছে আমাদের চোখে!

অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি'।
যাহা কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ।
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে!
বড় ছোট কিছু নাই, সকলি মহৎ।
আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু!
সীমা ত' কোথাও নাই, সীমা সে ত' ভ্রম!

সমুদ্রের অস্থিরতা দেখিয়া কবির মনে হইয়াছে—

কিসের অশান্তি এই মহা পারাবারে?
সতত ছিঁড়িতে চাহে কিসের বন্ধন!

'সোনার তরী'তে কবিচিত্ত বারবার অসীমের দিকে যাত্রা করিয়াছে।—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে,
হে সুন্দরি?
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী!

কবি নিজেই ইহার উত্তর দিয়াছেন—"শেষের মধ্যে অশেষ আছে" এবং "শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বল্‌বে!"

রবীন্দ্রনাথের চিত্ত ক্রমাগত 'বনের পাখীর' আহ্বান শুনিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতি যে মুক্ত আর জীব যে বদ্ধ—এবং এই কারণে দুইয়ের মিলনে যে বাধা জন্মায় একথা কবি উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার 'দুই-পাখী' নামক কবিতায়।—

বনের পাখী বলে, "খাঁচার পাখী ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।"
খাঁচার পাখী বলে, "বনের পাখী, আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।"
বনের পাখী বলে "না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।"
খাঁচার পাখী বলে, "হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব।"
বনের পাখী বলে "আকাশ ঘন নীল
কোথাও বাধা নাহি তার।"
খাঁচার পাখী বলে, "খাঁচাটি পরিপাটী
কেমন ঢাকা চারিধার।"
বনের পাখী বলে, "আপনা ছাড়ি' দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।"

ইহাও হইতেছে সীমা-অসীমের দ্বন্দ্ব। আমাদের অবরুদ্ধ মনের মধ্যে আসিয়া অচিন পাখী বন্ধনবিহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়। মন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহে, কিন্তু পাবে না। এই ব্যাকুলতার কারণ কবি নিজে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

"আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছা-বিহারপ্রিয় পুরুষ এবং গৃহবাসিনী অবরুদ্ধা রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন সমস্ত জগতের নূতন নূতন দেশ ঘটনা অবস্থার মধ্যে নব-নব রসাস্বাদ করিয়া আপন অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুলভাবে পরিপুষ্ট করিয়া

তুলিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল, আর একজন শত-সহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় আচ্ছন্ন-প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর-একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখী আর একজন খাঁচার পাখী। এই খাঁচার পাখীটাই বেশি করিয়া গান গাহে, কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুলতা একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধ ভাবে ও বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

—রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক সাহিত্য

কবি ক্রমাগত যাত্রা করিয়া 'অকূল পাড়ির আনন্দ' অনুভব করিবার জন্য ব্যগ্র। তটের রেখার দ্বারা কবির অসীমের দিকে যাত্রা যেন স্থগিত না হয়—তিনি 'অন্তবিহীন অজানাকে' জানিবার জন্য ব্যাকুল—

সকাল বেলায় ঘাটে যেদিন
ভাসিয়েছিলেম নৌকাখানি,
কোথায় আমার যেতে হবে
সে কথা কি কিছুই জানি ?
... ...
তুলুক তরী ঢেউয়ের 'পরে
ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ !
গাওরে আজি নিশীথ-রাতে
অকূল পাড়ির আনন্দ গান !
যাক্ না মুছে তটের রেখা,
নাইবা কিছু গেল দেখা,
অতল বারি দিক্ না সাড়া
বাঁধন-হারা হাওয়ার ডাকে।

দোসর ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে,
লও রে বুকে দুহাত মেলি'
অন্তবিহীন অজানাকে।

কবি তাঁহার মানস-সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

কোন্ বিশ্বপার
আছে তব জন্মভূমি? সঙ্গীত তোমার
কতদূরে নিয়ে যাবে, কোন্ লোকে!

'বসুন্ধরা' কবিতায় কবি জলস্থল-আকাশের সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়া নিজেকে অসীম বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিবার বাসনা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

ওগো মা মৃন্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত। বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার। হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চ'লে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হ'তে প্রান্তভাগে।—

কবির যাত্রা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'—একথা তিনি অনেকবারই বলিয়াছেন। কোথায় এবং কাহার অভিসারে তিনি যাত্রা সুরু করিয়াছেন তাহা কবি জানেন না।—

দুর্দ্দিনের অশ্রু-জল-ধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি'। তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবন-সর্ব্বস্ব-ধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি'। কে সে ? জানি না কে। চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানব-যাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে।

জীবনে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসা সত্ত্বেও কবির যাত্রা স্থগিত হয় না। তিনি একাকী নূতন পথে যাত্রা করিবার জন্য উন্মুখ। অজানা অসীমে কবিচিত্ত পক্ষবিস্তার করিয়া চলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জাগিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা।

অসীমের সহিত মিলিত হইবার জন্য কবির 'দুরন্ত আশা' জাগিয়াছে। কবি তাঁহার বহু কবিতাতেই ক্ষুদ্রত্ব এবং সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিতে চাহিয়াছেন। নিরীহ নির্জ্জীব অবস্থা কবির কাছে ভাল লাগে না। তিনি বলেন,—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন্!' মরুভূমির ঝড় যেমন অবাধে প্রবাহিত হয়, কবিও তেমনি উদ্দাম গতিমান্ প্রাণ পাইয়া

ক্রমাগত যাত্রা করিতে চাহেন। কবি 'বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান' থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক।—

ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবন-স্রোত আকাশে ঢালি,
হৃদয়-তলে বহ্নি জ্বালি, চলেছি নিশিদিন,
বরশা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ,—
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন।

কবি নিজেকে 'সুদূরের পিয়াসী' ও 'প্রবাসী' বলিয়াছেন। কবি সেই সুদূরের পরশ পাবার প্রয়াসী—

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।
দিন চলে যায় আমি আন্‌মনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী।

এই সুদূরের সহিত মিলিত হইতে না পারিলে কবির মনে ব্যথা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে।—

সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সে কথা যে যাই পাশরি'।

এই কবিতাতেও অনন্তের উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা, ক্রমাগত সীমাকে উত্তীর্ণ হইয়া অসীমের অভিমুখে যাত্রা করারই কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

উৎসর্গের 'প্রবাসী' কবিতার মধ্যেও এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। সেখানেও কবির কল্পনাবিলাসী মন অসীমের মধ্যে প্রসারিত হইয়াছে। জীব মাত্রেই অনন্ত অসীমের অংশ মাত্র। সেইজন্য কবি নিজেকে প্রবাসী বলিয়াছেন—অসীমের সহিত আত্মীয়তা-

বোধের জন্যই কবি অনুভব করেন যে তিনি প্রবাসী। কবি উপলব্ধি করিয়াছেন—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় আমার সাম্‌নে,
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে, কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি' কবে কোন্ ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সাম্‌নে।
নিশার আকাশ কেমন করিয়া তাকায় আমার পানে সে,
লক্ষ যোজন দূরের তারকা মোর নাম যেন জানে সে।
বিশাল বিশ্বে চারিদিক হ'তে প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ শত কোটি কর হানিছে।

ক্ষণিকার 'উদ্বোধন' কবিতায় কবি 'নদী-জলে পড়া আলোর মতন' ক্রমাগতই যাত্রা করিয়া চলিতে চাহিয়াছেন। বিশ্বের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ কবি উপভোগ করিতে চাহেন। কবি চাহেন বৈচিত্র্য—অকারণ পুলকে তিনি অসীমের দিকে আনন্দের উৎস-সন্ধানে যাত্রা করিতে উৎসুক।—

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।
ধরণীর পরে শিথিল বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস্ যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দোলে শিশির যেমন শিরীষ ফুলের অলকে।
মর্ম্মরতানে ভ'রে ওঠ্ গানে শুধু অকারণ পুলকে।

কবি বলিয়াছেন—

ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
একূল হইতে নব-জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।

'বর্ষশেষে'র সঙ্গে সঙ্গে কবিচিত্ত সকল প্রকার বন্ধন-মুক্ত হইয়া অনন্ত অসীমের উদ্দেশে যাত্রা করিবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছে—

হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াব উঠি', আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরাণ।
চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন-ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।

... .

যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখ মোরে, নিরখিব বিরাট্ স্বরূপ
যুগ-যুগান্তের।

এই কবিতার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া কবি নিজেই বলিয়াছেন—

"১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্ত্তে একটা প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি।·· এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে

হবে—ঝড় এসে শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। ...ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার ভিতকে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুঝ্‌লুম বেরিয়ে আস্‌তে হবে।"

কোন্ আদিকাল হইতে কবির এই অসীমের উদ্দেশ্যে যাত্রা সুরু হইয়াছে কবি তাহা জানেন—

জানি জানি কোন্ আদিকাল হ'তে
ভাসালে আমারে জীবন-স্রোতে।

অন্যত্রও কবি বলিয়াছেন—

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয়' সে আজকে নয়।

কবির যাত্রা অনাদি অনন্ত—

অনেক কালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে
প্রথম বাহির হয়েছিলেম
প্রথম আলোর রথে!

সকল বোঝা ফেলিয়া রিক্ত হাতে নিরুদ্দেশের উদ্দেশে কবি যাত্রা করিতে ইচ্ছুক।—

রিক্ত হাতে চল্‌না রাতে
নিরুদ্দেশের অন্বেষণে।

ক্রমাগত অসীমের দিকে তাঁহার জীবনতরী ভাসিয়া চলিয়াছে। কোথায় কোন্ দেশে কবির যাত্রা তাহা তিনি জানেন না।—

কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,
ত্রিভুবনে জান্‌বে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে।

তীরে বসিয়া কবির মন অধীর হইয়া উঠে। কিন্তু অসীমের বুকে পাড়ি দিবার আনন্দে কবি উল্লসিত হইয়া উঠেন।—

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে ব'সে যায় যে বেলা মরি গো মরি!

কবির এই অসীমের যাত্রা হইতে কেহই তাঁহাকে বিরত করিতে পারিবে না।—

যাত্রী আমি ওরে,
পার্‌বে না কেউ রাখ্‌তে আমায় ধ'রে।

সীমার পথে যাত্রা করিতে কবি অনিচ্ছুক—

বাঁধা পথের বাঁধন হ'তে
টলিয়ে দাও গো টলিয়ে দাও।
পথের শেষে মিল্‌বে বাসা
সে কভু নয় আমার আশা,
যা পাব তা পথেই পাব।
দুয়ার আমার খুলিয়ে দাও।

কারণ, তাঁহার কাছে সুদূরের ডাক আসিয়া পৌঁছায় বারবার—অনন্তকাল ধরিয়া অসীমের উদ্দেশে চলার আনন্দে কবি উল্লসিত। পথই তাঁহার সাথী—তিনি 'অকূল পাড়ির' পথের পথিক—তাঁহাব যাত্রা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'।

জগতের নদী গিরি অরণ্য অতিক্রম করিয়া নিজেকে ব্যাপ্ত

করিবার জন্য কবির অদম্য আকাঙ্ক্ষা। তাই 'শিশু ভোলানাথ' রূপে কবি বলিয়াছেন—

সাত সমুদ্র তের নদী
আজ্‌কে হব পার।

অন্যত্র—

আজ্‌কে আমি কতদূর যে
গিয়েছিলেম চ'লে।
যত তুমি ভাব্‌তে পারো
তার চেয়ে সে অনেক আরো,
শেষ কর্‌তে পার্‌ব না তা
তোমায় ব'লে ব'লে।
অনেক দূর সে, আরো দূর সে,
আরো অনেক দূর।

অসীমের উপলব্ধির জন্য ক্রমাগত তরী বাহিয়া ভাসিয়া চলা কবির ধর্ম্ম। এই ভাসিয়া চলার জন্য সকলকে তিনি তাঁহার নিমন্ত্রণ জানাইতেছেন—

পারবি নাকি যোগ দিতে এই ছন্দে রে
খ'সে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙ্‌বারই আনন্দে রে।
লুটে যাবার ছুটে যাবার
চল্‌বারই আনন্দে রে।

আমাদের জীবনের চারিদিকে অনবরত বাধা-বিপত্তির অচলায়তন গড়িয়া উঠিয়া আমাদের গতির বাধা সৃষ্টি করে। কবি সেই সীমার বাঁধ সহ্য করিতে পারেন না। অচলায়তনের

গণ্ডি ভাঙিয়া তিনি আমাদিগকে ক্রমাগত চলিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

বলাকার মধ্যে কবির 'এই অকারণ অবারণ চলা'র কথা খুব বেশি করিয়া ঘোষিত হইয়াছে। বলাকার প্রত্যেকটি কবিতা অজ্ঞাত অসীমের আহ্বানে ও ইঙ্গিতে ভরপূর। 'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনোখানে'—এবং 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে' বলিয়া কবি ক্রমাগত সেই অসীমের দিকে যাত্রা করিয়া চলিয়াছেন। তিনি তাঁহার অনন্ত যাত্রা স্থগিত করিতে অনিচ্ছুক।

কবি বলেন যে মানুষ ক্রমাগত নিজেকে উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইয়া চলিবে দেবত্ব লাভ করিবার জন্য—

নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্তসীমা,
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?
—বলাকা, ৩৭ নম্বর

অসীমের উদ্দেশ্যে নদীর যাত্রা। কিন্তু নদীর সেই গতি যদি স্থগিত হয় তাহা হইলেই আবিলতা আবর্জ্জনা জন্মে ও মৃত্যু উপস্থিত হয়।—

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি' তারে,
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়,
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

সর্ব্বজন সর্ব্বক্ষণ চলে যেই পথে,
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনমতে,—
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ 'পরে
তন্ত্র-মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।
—চৈতালি, দুই উপমা

'চঞ্চলা' কবিতাতেও কবি এই চলার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন।—

চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া?
সর্ব্বনাশা প্রেমে তার নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।

নদীর পরিবর্ত্তনের স্রোত ক্রমাগত চলিয়াছে—কবি সেই গতিপ্রবাহে গা-ভাসাইয়া দিয়া ক্রমাগত চলিতে চাহেন। বিশ্বের মধ্যে, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে—চলার যে লীলা হইতেছে তাহার অপরূপতা প্রত্যক্ষ করিয়া কবি যেন আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, এবং তাঁহার এই কবিতার ছন্দে সেই নৃত্যের দোলা প্রকাশ পাইয়াছে। অসীমের সর্ব্বনাশা প্রেমে নদীর স্রোতের অবাধ গতি কবির অন্তরে বেশ স্পষ্ট ছাপ রাখিয়াছে।

কবি জানেন, এবং বহু কবিতাতেই তিনি এই কথা বলিয়াছেন যে স্থিতিতে বস্তুর স্তূপ জমে, আর গতিতে বস্তুর রূপ ফুটিয়া উঠে। সেইজন্য কবি অসীমের দিকে যাত্রা করিয়া ক্রমাগতই চলিয়াছেন। নদীর স্থিতিহীন প্রবাহ তাঁহার অন্তরে অফুরন্ত আনন্দের সঞ্চার করে—

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও,
উদ্দাম উধাও,
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
যে মূহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মূহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি'
পলকে পলকে,
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হ'য়ে ঝলকে ঝলকে।

—বলাকা : চঞ্চলা

এই 'চঞ্চলা' কবিতাতেই নদীকে উদ্দেশ্য করিয়া কবি বলিতেছেন—

সম্মুখের বাণী
নিক্ তোরে টানি,
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে অকূল আলোতে।

ইহা কবিজীবনেরই আদর্শ। কবির প্রতিভা-নির্ঝর সেই 'প্রভাত-সঙ্গীতে'র যুগ হইতে অনন্ত অসীম সিন্ধুর উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে—তাহার সেই যাত্রা 'বলাকা'র যুগেও স্থগিত হয় নাই। তিনি ক্রমাগত অতল-আঁধারের ভিতর দিয়া অকূল-আলোকে যাত্রা করিতে ইচ্ছুক।

'বলাকা' কবিতাতে কবি 'পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ' শুনিয়াছেন। পর্ব্বত তরুশ্রেণী সকল কিছুই নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়া অসীমের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য যেন যাত্রা করিতে চাহিতেছে—ইহা কবি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন।—

পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ ওঠে জাগি'
সুদূরের লাগি'
হে পাখা বিবাগী।

অন্যত্র—

এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।

সমস্ত বিশ্ব-চরাচর যেন কবিকে কবিরই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়া দিতেছে যে সকল কিছুই সেই অসীমের উপলব্ধির জন্য ব্যাকুল। সবাই যেন ঘোষণা করিতেছে—

ওগো প্রাণে মনে আমি যে তোমার পরশ পাবার প্রয়াসী।

'বলাকা'র ৩৮ নম্বর কবিতায় ('নূতন বসন') কবি বলিয়াছেন যে তাঁহার সর্ব্বদেহে, তাঁহার অন্তরে তাঁহার চিন্তায়

ভাবনায় এবং তাঁহার প্রেমে নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। একখানি নূতন বসন পরিধান করিয়া কবির মনে এই ভাবটি খুব বেশি করিয়া জাগিতেছে। নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা নূতন বস্ত্ররূপে কবির সর্ব্বাঙ্গ যেন পরিবেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে—ইহা কবি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। গান যেমন বাঁধা সুর অতিক্রম করিয়া নূতন নূতন তানের উচ্ছ্বাসে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, তেম্‌নি কবির দেহ নূতন বসন পাইয়া প্রতিদিনের বাঁধা গণ্ডিকে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—

সর্ব্বদেহের ব্যাকুলতা কি বল্‌তে চায় বাণী,
তাই আমার এই নূতন বসনখানি।
নূতন সে মোর হিয়ার মধ্যে, দেখ্‌তে কি পায় কেউ!
সেই নূতনের ঢেউ
অঙ্গ বেয়ে পড়্‌ল ছেয়ে নূতন বসনখানি
দেহ-গানের তান যেন এই নিলেম বুকে টানি'।

কবি বলিতেছেন—নীল রং অনন্তের অকূলের বর্ণ। আজ আমি সেই নীল বসন পরিধান করিয়া অনন্তের অনন্ততাকে আমার বসনের বর্ণে প্রতিফলিত দেখিতেছি।—আমার দেহে-মনে দূরের ডাক লাগিয়াছে—যাহা আয়ত্ত তাহাকে ত্যাগ করিয়া অনায়ত্তকে ধরিতে যাত্রা করিতে হইবে, দূর হইতে দূরান্তরে অজানা অচেনাকে সন্ধান করিয়া ফিরিতে হইবে, যেমন করিয়া দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া চলে বৃষ্টিভরা ঈশান কোণের নব মেঘ। 'নব মেঘের বাণী' কূল ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রার জন্য কবির অন্তরকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।—

অকূলের এই বর্ণ, এ যে দিশাহারার নীল,
অন্য-পারের বনের সাথে মিল।
আজ্‌কে আমার সকল দেহে বইচে দূরের হাওয়া
সাগর পানে ধাওয়া।
আজ্‌কে আমার অঙ্গে আনে নূতন কাপড়খানি
বৃষ্টি-ভরা ঈশান কোণের নব মেঘের বাণী।

'বলাকা'র ৩ নম্বর কবিতায় কবি বলিয়াছেন যে পশ্চাতের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অনবরত ধাবিত হইতে পারাতেই মুক্তি।—

আমরা চলি সমুখ পানে,
কে আমাদের বাঁধবে?
রৈল যারা পিছুর টানে
কাঁদ্‌বে তারা কাঁদ্‌বে।

কবি তাঁহার মন অসীম আকাশে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া সাগর-গিরি লঙ্ঘন করিতে উৎসুক হইয়া বলিয়াছেন—

মন ছড়াল আকাশ ব্যেপে
আলোর নেশায় গেচি ক্ষেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে,
চক্ষু ওদের ধাঁধ্‌বে।
কাঁদ্‌বে ওরা কাঁদ্‌বে।
সাগর গিরি কর্‌বরে জয়
যাব তাদের লঙ্ঘি'।

সম্মুখ-ধাবনে কবি মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতে গিয়া পৌঁছাইতে চাহেন—

মৃত্যুসাগর মথন ক'রে
অমৃতরস আন্‌ব হ'রে।

কবি যখনই বিরাম বিশ্রামের আয়োজন করিয়াছেন তখনই অভয় 'শঙ্খ' তাঁহার কাছে গতির বাণী আনিয়া দিয়াছে। সেই শঙ্খধ্বনি কানে যাওয়াতে কবির বিরাম বিশ্রাম ঘুচিয়া যায়, একটা গতির উন্মাদনায় কবির চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন কবি আবার যাত্রার জন্য উৎসুক হইয়া বলিয়া উঠেন—

লড়্‌বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্‌না গেয়ে,
চল্‌বি যারা চল্‌রে ধেয়ে
আয় না রে নিঃশঙ্ক! —বলাকা, শঙ্খ

অনন্তের দেশ হইতে কবি নিমন্ত্রণ পান অসীমের দিকে যাত্রা করিবার জন্য—

এতদিনে আবার মোরে
বিষম জোরে
ডাক দিয়েচে আকাশ পাতাল।

* * *

ঘর-ছাড়ানো বাতাস আমায়
মুক্তি মদে কর্‌ল মাতাল!
খ'সে-পড়া তারার সাথে
নিশীথ রাতে
ঝাঁপ দিয়েচি অতল পানে
মরণ-টানে। বলাকা, ২২ নম্বর

কবি নিজেকে বলিয়াছেন—"আমি যে সেই বৈশাখী মেঘ বাঁধন-ছাড়া"। বৈশাখী মেঘের মতো কবির যাত্রার শেষ নাই। তিনি বলেন—

আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ।
সেই ত বাধায় সেই ত মেটায় দ্বন্দ্ব।
*			*			*
অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই ত মুক্তি,
তার সনে মোর চিরকালের চুক্তি।

বলাকা, ৩০ নম্বর

অতীতই সম্পদ্ আর ভবিষ্যৎ রিক্ত—কবির মতে এই ধারণা ভ্রান্ত—

সাম্‌নেকে তুই ভয় করেছিস্! পিছন তোরে ঘির্‌বে।
এম্‌নি কি তুই ভাগ্যহারা? ছিঁড়্‌বে বাঁধন ছিঁড়্‌বে!

সেইজন্য কবি ক্রমাগতই অজানার সঙ্গ পাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন—

কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ,
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ!

—বলাকা, ৩০ নম্বর

'বলাকা'র ৩৭ নম্বর কবিতাতে কবি কাণ্ডারীর আহ্বান শুনিতে পাইয়াছেন—তরী বাহিয়া তাঁহাকে নূতন সমুদ্রতীরে পাড়ি দিতে হইবে—

নূতন সমুদ্র-তীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,—

ডাকিছে কাণ্ডারী
এসেচে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হ'ল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না। —বলাকা, ৩৭ নম্বর

কবি সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতে চাহেন—

"যাত্রা কর, যাত্রা কর যাত্রীদল,"
উঠেচে আদেশ,
"বন্দরের কাল হ'ল শেষ।"— বলাকা ৩৭ নম্বব

অনন্ত অসীমের আহ্বানে জানাকে উত্তীর্ণ হইয়া অজ্ঞাতের সন্ধানে যাত্রা করিবার জন্য কবি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন।—

অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ,—
সেথাকার লাগি'
উঠিয়াছে জাগি'
ঝটিকাব কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।
—বলাকা, ৩৭ নম্বর

ফাল্গুনী নাটকে যুবকদল ক্রমাগত 'চলি গো চলি গো যাই গো চ'লে' বলিয়া অসীমের সন্ধানে ও অনায়ত্তকে আয়ত্ত করিবার আকাঙ্ক্ষায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বলাকার যুগেও কবি সেই কথা বলিয়াছেন—হে নবীন! তুমি পথহীন সাগরপারের পথিক, তোমার ডানা চঞ্চল অক্লান্ত। তোমাকে আজ অজানা বাসা সন্ধান করিয়া লইতে হইবে,—জানার বাসা হইতে বাহিব হইয়া পড়িতে হইবে।—

তুই পথহীন সাগরপারের পান্থ,
তোর ডানা যে অশান্ত অক্লান্ত,

অজানা তোর বাসার সন্ধানে রে
অবাধ যে তোর ধাওয়া।

স্থিরতাকে ধিক্‌কার দিয়া কবি নূতনকে বরণ করিতে ইচ্ছুক। পরিবর্ত্তনের গতির দ্বারা কবি তাঁহার মনকে নানান্ সম্পদে ভূষিত করিয়া তুলিতে চাহেন। কারণ চলার অমৃত-রসপানে মনের যৌবন বিকশিত হইয়া উঠে—

পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।

এই কারণে কবি নিজেকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—

ওগো আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।
কেন মিছে
আমারে ডাকিস্ পিছে? —বলাকা, ১৮ নম্বর

'পলাতকা' কাব্যের মধ্যেও অসীমের প্রবল আকর্ষণের কথা আছে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য দিয়া অসীমের এই আহ্বান কবির কাছে আসিয়াছিল। প্রকৃতির ডাকে পোষা হরিণ অনিশ্চিতের ও নিরুদ্দেশের সন্ধানে বনে চলিয়া গেল। পলাতক হরিণ যেন বলিয়া গেল—'বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর!'

'পূরবী'র যুগেও বিরাম বা বিরতির কথা কবির মনে হয় নাই। সেখানেও তিনি ক্রমাগত 'চলো চলো' বাণী ঘোষণা করিয়া অসীমের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন—

আশ্বিনের রাত্রি-শেষে ঝ'রে-পড়া শিউলি ফুলের
আগ্রহে আকুল বনতল, তা'রা মরণ-কূলের
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে ; শুধু বলে, 'চলো চলো !'

* * * *

ওরা ডেকে বলে কবি,
সে তীর্থে কি তুমি সঙ্গে যাবে ?

ইহার উত্তরে কবি বলেন—

যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে···।

জীবন-সায়াহ্নেও কবির যাত্রা স্থগিত হয় নাই। তখনও তাঁহার কাছে জীবনদেবতার আহ্বান আসিয়াছে নূতন পথে যাত্রা সুরু করিবার জন্য—সেই আহ্বানে কবির যৌবনোল্লাস ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তিনি তাঁহার 'লীলাসঙ্গিনী' জীবন-দেবতাকে বলিয়াছেন—

কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা
কাজের কক্ষ-কোণে ?
সাথী খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা
তব খেলা-প্রাঙ্গণে ?
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘর-ছাড়া যত দিশা-হারাদের দলে,
অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে ? —লীলাসঙ্গিনী

'পূরবী'র খেলা নামক কবিতাতেও তিনি তাঁহার জীবন-দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন যে—তিনি কখনও তাঁহাকে বাঁধা পথের গণ্ডির মধ্যে চলিতে দেন না। জীবনদেবতা ক্রমাগত তাঁহাকে ক্রীড়াচ্ছলে সীমাবদ্ধ জীবন

পরিত্যাগ করাইয়া অসীমের ইঙ্গিত দেখাইয়া 'অকারণের টানে' আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান।--

বাঁধা পথের বাঁধন মেনে চল্‌তি কাজের স্রোতে
চল্‌তে দেবে নাকো ?
সন্ধ্যাবেলায় জোনাক-জ্বালা বনের আঁধার হ'তে
তাই কি আমায় ডাকো ?—পূরবী, খেলা

'মহুয়া' কাব্যেও কবির কণ্ঠে এই চলার বাণী উৎসারিত হইয়াছে—

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও ?
তা'রি রথ নিত্যই উধাও।—

কিশোর বয়স হইতে পরিণত বয়স পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যত কাব্য রচিত হইয়াছে সে সকলের মধ্যেই কবি ক্রমাগত একটা দুর্নিবার গতির আবেগে যাত্রা করিয়াই চলিয়াছেন। কোথাও তাঁহার এই যাত্রা স্থগিত হয় নাই। তিনি চিরকাল অনাসক্ত অনন্তপথযাত্রী পথিক। এইজন্য তিনি বলিতেছেন—"যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ"। সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে তাঁহার কবিচিত্ত ক্রমাগত বিচিত্রতার সন্ধানে অসীমের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। চিরতরুণ কবির অনন্ত-প্রসারী মন তাঁহার সকল কাব্যের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অসীমের দিকে ক্রমাগত যাত্রা করার এই যে বাণী রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে উৎসারিত হইয়াছে ইহাই তাঁহার কাব্যের বিশেষত্ব এবং মূল কথা।

প্রেম ও সৌন্দর্য্যবোধ

কবিমাত্রেই রসস্রষ্টা এবং সকল কবির রসসৃষ্টির মূলে তাঁহার সৌন্দর্য্যসাধনা কাজ করিয়া থাকে। তবে, সকল কবির সৌন্দর্য্যচেতনা একজাতীয় নয়। সৌন্দর্য্যচেতনা ও সৌন্দর্য্য-বোধের প্রকারভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যকে শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়া উপলব্ধি করেন নাই। হৃদয়ভাবের দ্বারা, অধ্যাত্মদৃষ্টির দ্বারা তিনি বিশ্বসৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কবির নিজের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

"শুধু চোখের দৃষ্টি নহে, তাহার পিছনে মনের দৃষ্টি যোগ না দিলে সৌন্দর্য্যকে বড় করিয়া দেখা যায় না। মনেরও আবার অনেক স্তর আছে। কেবল বুদ্ধিবিচার দিয়া আমরা যতটুকু দেখিতে পাই, তাহার সহিত হৃদয়ভাবের যোগ দিলে ক্ষেত্র আরো বাড়িয়া যায়। ধর্ম্মবুদ্ধি যোগ দিলে আরো অনেকদূর চোখে পড়ে। অধ্যাত্মদৃষ্টি খুলিয়া গেলে দৃষ্টিক্ষেত্রের আর সীমা পাওয়া যায় না।"

সৌন্দর্য্যবোধের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে চিরদিন তাঁহার এই উক্তির অনুসারী ছিলেন তাহার পরিচয় কবির কয়েকটি কাব্য নাটক ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিলেই চোখে পড়িয়া থাকে।

কড়ি ও কোমলের যুগে—যে যুগে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-ভোগস্পৃহা প্রথম জাগিতে সুরু করিয়াছিল,—সেই যুগে তিনি

মুখ্যতঃ ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য্যের উপাসক। বস্তুবিশ্বের সৌন্দর্য্যকে তিনি তখন ইন্দ্রিয়গোচর করিতে চাহিয়াছেন। সে যুগে নারীর দেহসৌন্দর্য্য কবিচিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছে। কবি তখনও চোখের দৃষ্টি দিয়াই প্রধানতঃ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যকে তিনি ঐ যুগ পর্য্যন্ত খণ্ড-বিচ্ছিন্নরূপেই দেখিয়াছেন। রচনা করিয়াছেন বাহু, চরণ, তনু প্রভৃতি কবিতা। তখন পর্য্যন্ত কবি কেবল বিশ্বজগতের বাহ্য সৌন্দর্য্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সসীম সৌন্দর্য্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে কবি ঐ যুগে বিচরণ করিয়াছেন। মনের চেয়ে দেহের সৌন্দর্য্যই তখন পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি বেশি করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে। তখনও সাধনার প্রদীপ্ত অনলে অতনুর তনু ভস্ম হয় নাই। সৌন্দর্য্যের অন্তঃপুরে কবি তখনও তাঁহার দৃষ্টিকে প্রসারিত করিতে পারেন নাই।

কিন্তু ঐ 'কড়ি ও কোমল' কাব্যেই ভোগাকাঙ্ক্ষার সহিত একটা গভীর অতৃপ্তিও গোপনে লুকাইয়া ছিল। ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জনে তিনি তৃপ্তি পান নাই। সীমা-বদ্ধতার সঙ্কীর্ণতা কবিকে ঐ যুগেই পীড়িত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার ফলে কবির অধ্যাত্মদৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে— কবি তখন ভোগের সমস্ত ক্ষণিকতা, সঙ্কীর্ণতা ও ব্যর্থতার ঊর্দ্ধে সৌন্দর্য্যের যে চিরন্তন পরমমনোহর রূপ আছে তাহার সন্ধানে রত হইয়াছেন। দেহের মধ্যে সন্ধান করিয়াছেন দেহাতীত সৌন্দর্য্যকে; বস্তুবিশ্বের উপর দিয়া চোখ বুলাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু বস্তুর অতীত সৌন্দর্য্যকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন। উহার সন্ধানও তিনি পাইয়াছেন এবং তখন দেহসৌন্দর্য্য-

ভোগাকাঙ্ক্ষাকে সেই বৃহত্তর সৌন্দর্য্যভোগাকাঙ্ক্ষার মধ্যে কবি পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন—বস্তুদেহ তখন ভাবদেহের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

খণ্ড প্রেম ও খণ্ড সৌন্দর্য্যকে নিত্যকালের প্রেম ও সৌন্দর্য্যের সহিত যুক্ত করিয়া দেখা রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনার অন্যতম বিশেষত্ব। এ কল্পনার উন্মেষও কড়ি ও কোমলের যুগে হইয়াছে। খণ্ড সৌন্দর্য্যের মধ্যে অনন্তের আভাস রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কড়ি ও কোমল রচনার কাল হইতেই পাইতে সুরু করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যকে অনাদি অনন্ত বলিয়া তিনি ঐ যুগেই জানিয়াছেন। তাই ক্ষুদ্রের মধ্যে, সামান্যের মধ্যে, সাধারণের মধ্যে, যেখানেই তিনি সুন্দরের আভাসটুকু পাইয়াছেন, সেখানেই তাহাকে বৃহতের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন।

একালের প্রিয়ার পানে চাহিয়া, নারী-সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া—কবির মনে পড়িয়াছে জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি। বলিয়াছেন,—

ওই দেহপানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্ব্ব-জনমের স্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে,
জন্ম-জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।
যেন গো আমারি তুমি আত্ম-বিস্মরণ,
অনন্ত কালের মোর সুখ-দুঃখ শোক ;
কত নব জগতের কুসুম-কানন
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক।

সেই হাসি, সেই অশ্রু, সেই সব কথা
মধুর মুরতি ধরি দেখা দিল আজ।
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন।
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন ॥

—স্মৃতি, কড়ি ও কোমল

মানসীর অনন্ত-প্রেম কবিতাতেও কবিকে বলিতে শুনি—

একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি,—
সকল কালের সকল কবির গীতি।

—অনন্ত প্রেম, মানসী

'চিত্রা'র প্রেমের অভিষেক কবিতাতেও কবির অনুরূপ অনুভূতির সঞ্চার হইয়াছে।—

—হাত ধরে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্য্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান্
অক্ষয়-যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী ; সেথা মোর সভাসদ
রবিচন্দ্রতারা, পরি নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তারা নব নব গান
নব অর্থভরা ; চির সুহৃদ্‌সমান
সর্ব্ব চরাচর ॥

—চিত্রা, প্রেমের অভিষেক

কড়ি ও কোমলের পরবর্ত্তী কাব্য মানসী। মানসীতে মানস-সুন্দরীর সাক্ষাৎজনিত আনন্দে কবিচিত্ত মাতিয়া উঠিয়াছে, নৃত্য করিয়াছে। এই যুগে মানবীর মধ্যে মানসীর সন্ধান পাইয়া কবিমন আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, এই যুগে কবি রূপের মধ্যে রূপাতীতকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য যে ইন্দ্রিয়ভোগের অতীত, অসীম, অখণ্ড,—এ বোধ কবির মধ্যে বড় বেশি করিয়া মানসীতেই জাগিয়াছে। সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীত, ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমলের ভিতরে সৌন্দর্য্যকে মুখ্যতঃ খণ্ডবিচ্ছিন্নভাবে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর একটি পূর্ণপরিণত অখণ্ড ছবি কবির মানস-লোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। মানসীতে তাহাই পূর্ণ প্রাণের দীপ্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিল। সৌন্দর্য্যকে তাহার পরি-পূর্ণতায় অখণ্ডতায় বিশুদ্ধিতায় কবি এই যুগেই সর্ব্বপ্রথম বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন। 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় দেখিতে পাই, কবিহৃদয়ের সুপ্ত প্রেমকে, সৌন্দয্যপূজার হোমশিখাকে প্রদীপ্ত করিয়াছে নারী। কিন্তু কবির অনন্ত সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা মূর্ত্তির সীমায় পরিতৃপ্ত হইল না। অমূর্ত্ত সৌন্দর্য্য হৃদয় দিয়া অনুভব করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"হৃদয় আকাশে থাক না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি।"

যে সৌন্দর্য্য সীমার বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছে, তাহা হইতে মুক্তির বাসনা এবং Absolute বা অখণ্ড সৌন্দর্য্যকে হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া তৃপ্তিলাভের কামনা ঐ কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে।

মানসীর যুগ হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিমানস কালিদাসের বিরহী যক্ষের মত এক চির-অম্লান, চিরসৌন্দর্য্যলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ব্যাকুলতাও অনুভব করিয়াছে। তাই এই যুগ হইতে ক্ষণসুন্দরকে পরিত্যাগ করিয়া চিরসুন্দরের রাজ্যে বিচরণ করার বাসনা কবি প্রকাশ করিয়াছেন দেখিতে পাই। এখন হইতে কবির স্বচ্ছন্দ স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনা অবলীলাক্রমে সুদূর অতীতে, সৌন্দর্য্যের নন্দনভূমিতে বিচরণ করিয়াছে। 'মেঘদূত' কবিতায় কবির গৃহত্যাগী মন—

মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে।

তারপর সানুমান আম্রকূটের সন্নিধানে, বিমল বিশীর্ণ রেবাতটে, বেত্রবতীকূলে, শিপ্রাতটে—কিংবা বিদিশা, দশার্ণ উজ্জয়িনী প্রভৃতি কত কত গ্রামে কবিচিত্ত ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছে। অবশেষে কবি উপনীত হইয়াছেন—

কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্য্যের আদি সৃষ্টি।

'কল্পনা' কাব্যের মধ্যেও কবি অতি সহজেই 'দূরে বহুদূরে উজ্জয়িনীপুরে' গিয়াছেন এবং লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম, কুরুবক ও কুন্দকলি-প্রসাধিতা পূর্ব্বজন্মের প্রথমা প্রিয়ার সান্নিধ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে—সেই কল্পলোক-বাসিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর সহিত কবির সাক্ষাৎ

হইয়াছে, কিন্তু তাহা মিলনে পর্য্যবসিত হয় নাই। কারণ, কবির কথায়ই—

মিলনে মলিন তুমি
বিরহে শ্রেয়সী।

মিলনে—'দেহ শুধু হাতে আসে শ্রান্ত করে হিয়া'। কিন্তু বিরহে কবির মধ্যে মিলনের আকাঙ্ক্ষা নিবিড়তর হইয়াছে—বিরহে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে সীমায় না দেখিয়া তাহাকে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত দেখিয়াছেন, সৌন্দর্য্যকে তাহার অসীমতায় উপলব্ধি করিয়াছেন। এইরূপে আপনার অনুভূতির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিয়া সমস্ত কালের এবং সমস্ত মানবের মধ্যে বৃহত্তর ভাবে উপলব্ধি করার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যোপলব্ধির সার্থকতা ঘটিয়াছে।

মানসীর পরবর্ত্তী কাব্য 'সোনার তরী'। কবির সৌন্দর্য্য-তন্ময়তা এই কাব্যে প্রকাশিত। নানা রেখা ও বর্ণ-বৈচিত্র্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য তিনি ইতিপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাকে অখণ্ড সৌন্দর্য্য-প্রতিমারূপে—মানসসুন্দরী-রূপে কবি এ যুগে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেই সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর আহ্বানে এই যুগে কবি দিগন্তবিস্তৃত সৌন্দর্য্য-সাগরের বুকে নিরুদ্দেশ যাত্রায় সোনার তরী ভাসাইয়াছেন। অধীর হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।

সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর নিকট হইতে কবি তাঁহার এ প্রশ্নের কোন উত্তর পান না। কাব্যলক্ষ্মী বা সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর ইঙ্গিতটুকুমাত্র তিনি বুঝিতে পারেন,—বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাকে অসম্পূর্ণতা হইতে সম্পূর্ণতার দিকে নিরন্তর ধাবিত হইয়া চলিতে হইবে—"শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বল্‌বে!"—তাই, সৌন্দর্য্যসন্ধানে নিরুদ্দেশ-যাত্রাই কবির লক্ষ্য।

সোনার তরীর পরবর্ত্তী কাব্য 'চিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-বোধের চরম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে দেখিতে পাই। চিত্রা, জ্যোৎস্নারাতে, পূর্ণিমা, উর্ব্বশী ও বিজয়িনী—চিত্রার এই কয়টি কবিতাব মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যবোধ বিশেষ একটি ভঙ্গিতে ফুটিয়াছে।

চিত্রা কবিতাটিতে কবি সৌন্দর্য্যকে বহির্জগতে এক প্রকারে দেখিয়াছেন, অন্তরে ভিন্নভাবে তাহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। বহির্জগতে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর রূপ পার্থিব বস্তুনিচয়ের মধ্য দিয়া বহু বিচিত্র রূপে প্রকাশ পাইয়াছে—ফলে ফুলে, গন্ধে বর্ণে, নানা সঙ্গীতে, নানা রসে, নানা ভাবে তাহা প্রকাশিত।—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে
তুমি চঞ্চলগামিনী।

* * *

কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত,
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রটিত,
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত—
তব অসংখ্য কাহিনী।

কিন্তু বাহিরে যে সৌন্দর্য্য বিচিত্র চঞ্চল,—অন্তরে তাহাই এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, স্থির গম্ভীর।

অন্তরমাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

সৌন্দর্য্যের পূজারী কবি জ্যোৎস্নারাত্রে তাঁহার এই কল্পলোকবাসিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর দেখা পাইবার প্রত্যাশী। তাই বলিয়াছেন—

কোনো মর্ত্ত্য দেখে নাই
যে দিব্য মূরতি, আমারে দেখাও তাই
এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।

নারী-সৌন্দর্য্যের বন্দনাগান কবির চিত্রা কাব্যের অন্তর্গত উর্ব্বশী কবিতাটি। উর্ব্বশী মাতা কন্যা বা গৃহিণী নয়—সে নারী, সকল সম্বন্ধের অতীত, সে হইতেছে সসীম সৌন্দর্য্য-প্রতিমার মধ্যে অবিমিশ্র মাধুর্য্য। উর্ব্বশী রূপের মধ্যে রূপাতীত। সে যেন চির-যৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত। সৌন্দর্য্যকে কবি তাহার পরিপূর্ণতায় উর্ব্বশীর রূপের মধ্যে প্রকাশ লাভ করিতে দেখিয়াছেন।

বিজয়িনী কবিতায় কবি সকল সৌন্দর্য্যের আধার এক নারীমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই মহিমসৌন্দর্য্যের মহিমার

কাছে মদন পরাভূত। কারণ, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যকে ইন্দ্রিয়-লালসাগোচর করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথে সৌন্দর্য্যচেতনা ও কল্যাণচেতনা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সৌন্দর্য্যবোধের সহিত শিববোধের সমন্বয় তাঁহার মধ্যে ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে কবি ভারতীয় সৌন্দর্য্যচেতনার অনুসারী।

কবি কালিদাসে সৌন্দর্য্যচেতনা এবং কল্যাণচেতনার সমন্বয়-সাধন হইয়াছে দেখা যায়। তিনি নরনারীর স্বাভাবিক আকর্ষণের মাধুর্য্য এবং সৌন্দর্য্যকে তাঁহার কুমারসম্ভব কাব্যে ও শকুন্তলা নাটকে ফুটাইয়াছেন সত্য। কিন্তু বাসনা-কামনার মধ্যেই, অথবা যৌবনের উৎসবক্ষেত্রেই কালিদাস তাঁহার কাব্যনাটকের নায়কনায়িকার মিলনকে পরিপূর্ণতা দান করেন নাই। বাসনার চাঞ্চল্যকে বেদনার তপস্যায় পবিত্র করিয়া তুলিয়া কালিদাস নরনারীর মিলনকে—সৌন্দর্য্যতৃষ্ণাকে বড়ো করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন। কুমারসম্ভবে অকাল বসন্ত-সমাগমে পুষ্পিতপ্রলাপের প্রগলভতার মধ্যে হরপার্ব্বতীর মিলন সাধিত হয় নাই। ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ মিলনকুঞ্জ রচনায়ই কুমারসম্ভব কাব্য পর্য্যবসিত হইয়া যায় নাই! পবিত্র এক যজ্ঞভূমিতে পৌঁছিয়া হরপার্ব্বতীর মিলন পূর্ণতর পরিণতি লাভ করিয়াছে।

দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেম যেখানে মত্ততার দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল, যেখানে শুধুই মোহ,—কর্ত্তব্যের আহ্বান কল্যাণধর্ম্মের আহ্বান যেখানে অয়ম্ অহং ভোঃ বলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াও

উপেক্ষিত,—সেখানে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের সমাপ্তি হয় নাই। কালিদাস তাঁহার নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন সেইখানে, যেখানে প্রেয়সী হইয়াছেন জননী; বাসনার চাঞ্চল্য যেখানে বেদনার তপস্যায় পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে, দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেম সেইখানে চরম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে আমরা দুইটি তপোবনের সাক্ষাৎ পাই—একটি কণ্বের তপোবন; অন্যটি মারীচের তপোবন। কণ্বের তপোবনে শকুন্তলা মধুর, মারীচের তপোবনে মধুরের সহিত মঙ্গলের মিলন—শকুন্তলার রূপের পূর্ণতা।

কণ্বের তপোবনে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেম মহৎ প্রেমের আসনে উন্নীত হয় নাই। সেখানে কেবল আসক্তি ছিল, আহুতি ছিল না। সেখানে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাব অপেক্ষা মদনের আধিপত্য অধিক। কিন্তু নাটকের শেষে ঐহিক দেহ-সীমায়িত প্রেমকে অনৈহিক ঔজ্জ্বল্যে—দুঃখের আগুনে নিকষিত হেম হইয়া উঠিতে দেখিয়া বুঝিতে পারি—"মহৎ প্রেম মহৎ দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত।" সৌন্দর্য্যের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে ঐ দুঃখটুকু, অশ্রুটুকু না থাকিলে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ব্যর্থতা। তাই 'জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা'—একথা রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যপ্রতিমা উর্ব্বশীকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলিয়াছেন।

প্রথমেই বলিয়াছি—রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মদৃষ্টি লইয়া সৌন্দর্য্যের পানে চিরদিনই চাহিয়া গিয়াছেন। এই অধ্যাত্মদৃষ্টি না

থাকিলে সৌন্দর্য্যোপলব্ধি যে করা যায় না এমন নহে। কিন্তু সৌন্দর্য্যোপলব্ধির বেলায় ঐ অধ্যাত্মদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের খুলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই কবি সৌন্দর্য্যকে নূতনভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সৌন্দর্য্যবোধের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বকীয়তার পরিচয় দান করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যকে কালিদাসের মত কেবল মধুর ও মঙ্গলের সমন্বয়রূপিণী করিয়াই দেখেন নাই। সৌন্দর্য্যকে তিনি নিত্যকালের সৌন্দর্য্যের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন। সৌন্দর্য্যকে তাহার পরিপূর্ণতায় অখণ্ডতায় বিশুদ্ধিতায় উপলব্ধি করিবার জন্য খণ্ডকে, ক্ষণিককে অখণ্ড ও চিরন্তনের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিবার বাসনা কবিচিত্তকে বিশেষভাবেই অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। ব্যক্তিগত প্রেমলীলার মধ্যে জগতের সমস্ত প্রেমলীলার অনুভূতি রবীন্দ্রনাথে জাগিয়াছে। সুন্দর সৃষ্টি দেখিবামাত্র সৌন্দর্য্যের উৎসসন্ধানে যাত্রার আকুতি রবীন্দ্রনাথে কেবলই প্রকাশ পাইয়াছে দেখিতে পাই।

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষ

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট সাহিত্য এক মহাভাবের ব্যঞ্জনায়, লোকাতীতের মহিমায় মণ্ডিত। এই মহাভাবকে বলা যাইতে পারে পূর্ণতার উপলব্ধি। অখণ্ডতা ও পূর্ণতার সাধনাই তাঁহার জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল। যে ভাব খণ্ডতার প্রাচীরে আবদ্ধ তাহা কোনদিনও তাঁহার দ্বারা প্রশংসিত হয় নাই। সমস্ত খণ্ডতা, তুচ্ছতা, অপূর্ণতার উর্দ্ধে যে জগৎ, সেই জগতের স্পর্শ-লাভের জন্য একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা কবিচিত্তকে অধিকার করিয়াছিল বলিয়াই বর্ত্তমান জীবনধারার ও রীতিনীতির অবনতি তাঁহাকে পীড়া দিয়াছে এবং এই কারণেই মুক্ত উদার ভারতবর্ষের অতীত দিনগুলি তিনি ফিরিয়া পাইবার ব্যাকুলতা বারংবার প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সভ্যতায়, তিনি দেখিয়াছিলেন 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস' এবং—

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম, প্রলয়-মনন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা উঠিয়াছে জাগি'
পঙ্কশয্যা হ'তে।

কিন্তু প্রাচীন ভারতের মধ্যে কবিচিত্ত অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতিলাভের ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। অতীত ভারতবর্ষের অনুশোচনায় কবি গাহিয়াছেন—

আর বার এ ভারতে কে দিবে গো আনি'
সে মহা আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্ত বাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়

পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্ত্তা ?

রবীন্দ্রনাথ ভারতের স্বরূপগত পরিচয়টি পাইয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার দেশপ্রেম জাগ্রত হইয়াছিল এবং সেই দেশ-প্রেমের উজান বাহিয়া তিনি প্রাচীন ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের সত্য ও শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতিষ্ঠাভূমিতে চিত্তকে স্থাপন করিয়া তিনি সমগ্র পৃথিবী ও সমস্ত মানবকে ভালবাসিয়াছিলেন। ভারতের ধ্যানধারণা, ভারতের তপস্যা, নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ উজ্জ্বল আদর্শ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। যে জীবন ভারতের তপোবনে ছিল, যে আদর্শ ভারতের রাজসিংহাসনে ছিল, সেই মহাজীবনকে তিনি প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন—

দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন,
তোমার মন্ত্র অগ্নি-বচন
তাই আমাদের দিয়ো।

ভারতীয় আদর্শের প্রতি কবির আকর্ষণ তাঁহার চৈতালি, নৈবেদ্য প্রভৃতি কাব্যে নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই আদর্শকে তিনি এ যুগের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র বেশ ; শিখায়েছ বীরে
ধর্ম্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,

ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্ম্মীরে শিখালে তুমি যোগমুক্ত চিতে
সর্ব্বফল-স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছো তুমি সংযমের সাথে,
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছো উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্য কর্ম্মে করেছো মঙ্গল
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি' সর্ব্ব দুঃখে সুখে
সংসারে রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে ॥

—নৈবেদ্য, শিক্ষা

অতীত ভারতের মহৎ আদর্শে কবি এ যুগের ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করিবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার 'কথা' ও 'কাহিনী'র কবিতাসকল রচনা করিয়া গিয়াছেন, শ্রীনিকেতন ও শান্তি-নিকেতন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আকর্ষণজীবি সভ্যতাকে ভারতীয় আদর্শের বিরোধী দেখিয়া তিনি কর্ষণজীবি সভ্যতার পীঠভূমি স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন শ্রীনিকেতনে। শান্তি-নিকেতনকে ভারতীয় তপোবনের আদর্শে গড়িয়া তুলিয়া-ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের উপর প্রাচীন ভারতের তপোবনের প্রভাব গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। কবি ভারতের তপো-বনকে, তপোবনের আদর্শকে অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন।

কবি তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে ভারতের সভ্যতার পটভূমিই হইতেছে মহারণ্য। সেখানে—

রাজা রাজ্য অভিমান রাখি লোকালয়ে
অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নতশিরে
গুরুর মন্ত্রণা লাগি'।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় নগরের পরিণাম তপোবন। নগর ও তপোবনে কোনো বিরোধ তিনি দেখেন নাই। যে রাজা একদিন প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করেন—যথাসময়ে তিনিই ভোগস্পৃহাকে ত্যাগে পরিণত করিয়া শান্ত তৃপ্ত মনে তপোবনে প্রবেশ করেন।

"একদিকে গৃহধর্ম্মের কল্যাণ-বন্ধন, অন্যদিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধনমোচন,--এই দুই-ই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব।"

ভারতীয় তপোবনের মধ্যে কবি প্রকৃতির সহিত মানবের এক অচ্ছেদ্য আত্মীয়তার বন্ধন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই বন্ধনটুকু মানুষের জীবনকে শান্তিতে ও সুষমায় যে ভরিয়া তোলে ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রকৃতি যে মানুষের ক্ষুব্ধ দুঃখিত চিত্তে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলাইয়া দেয় ইহা বুঝিয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি চৈতালিতে আকুল কণ্ঠে গাহিয়া গিয়াছেন—

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লহো তব লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্ব্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি,—সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবার ধান্যের মুষ্টি, বল্কল বসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন

মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণ পিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব ;—
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,—
পরাণে স্পর্শিতে চাই—ছিঁড়িয়া বন্ধন—
অনন্ত এ জগতের হৃদয় স্পন্দন।

—চৈতালি, সভ্যতার প্রতি

ভারতবর্ষকে কবি মহামানবের মিলনতীর্থ বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্ব সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতামুক্ত ভারতকে তিনি পুনর্জাগ্রত দেখিতে চাহিয়াছিলেন।

ভারতের বিকাশের পূর্ণতার জন্য আচার প্রথা সংস্কার ইত্যাদি—যাহা জীবনের মহিমা খর্ব্ব করে, জীবনকে খণ্ডিত করে—তাহাকে কবি নির্ম্মমভাবে আঘাত করিয়া গিয়াছেন।—

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি,
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি',
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত!

তিনি দেশের হীনতাকে ও দীনতাকে ঘৃণাভরে ত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, দেশবাসীকে বৃহত্তর জীবনের আশায় সঞ্জীবিত করিয়াছেন এবং বিশ্বের সকলের হাত ধরিয়া মানবতাধর্ম্মে অগ্রসর হইতে নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। কবি আমাদিগের হৃদয়ে অনাদ্যন্ত অসীমে অনুরাগ জাগাইয়াছেন, ভারতবর্ষের বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করিয়া মহত্তর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবার প্রেরণা আমাদের মধ্যে সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রসাহিত্যে মানবতা

সমাজের নগণ্য বা সাধারণ নবনারীর কথা রবীন্দ্রসাহিত্যের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। সমাজের অবহেলিত অবজ্ঞাত সামান্য সাধারণ যাহারা, তাহারা রবীন্দ্রসাহিত্যে সম্মানিত। তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা ও চরিত্রমাহাত্ম্য রবীন্দ্রসাহিত্যে উজ্জ্বলবর্ণেই অঙ্কিত হইয়াছে। সমাজের সকল স্তরের লোকের প্রতি কবির ছিল অপরিসীম সহানুভূতি। সেই অসাধারণ সহমর্মিতার বশে কবি সামান্যের মধ্যেও অসামান্যতার আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি দরিদ্রকে, অতি সামান্য সাধারণ ব্যক্তিকেও মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহার সাহিত্যে। তাহাদের অন্তরের মাধুর্য্য, চরিত্রের মহনীয়তা ও উদারতা কবির সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল।

কবি যদিও একবার ব্যঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন—

আকাশ মাঝে জাল ফেলে তারা ধরাই ব্যবসা
কাজ কি আমার ভবের হাটে মথুর কুণ্ডু শিবু সা।

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে নিছক ভাববিলাসিতায় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই, বরং—

ছোট প্রাণ ছোট কথা ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল,—

চিরন্তন করিয়া রাখিবার প্রয়াস তিনি করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ম্লান মূক নতশির জনগণের বেদনার করুণ কাহিনী তাঁহার কাব্য নাটক গল্পে বিবৃত করিয়াছেন,—তাহাদের মধ্য হইতেও উদারতা মহত্ত্ব প্রভৃতি গুণের আবিষ্কার করিয়াছেন।

কবির মনের মন্দিরে সকলেরই স্থান ছিল। অসুন্দব বা ছোট বলিয়া কাহাকেও তিনি অবজ্ঞা করেন নাই। সমাজ যাহাদের ছোট বলিয়া মনে করিয়াছে, স্থূল দৃষ্টিতে যাহাদেব পানে চাহিয়া মনে হইয়াছে যে তাহারা দীন—কবি তাহাদের মধ্যেও সুন্দরের সন্ধান পাইয়াছেন। বাহিরের দীনতা যে মানুষের প্রকৃত রূপ নয়, একথা কবি বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই বাহিরের পরিচয়ে কবি মানুষের বিচাব করেন নাই, মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তিনি মানুষকে মর্য্যাদা দান করিয়াছেন।

তাঁহার কবিতায় পুরাতন ভৃত্য কৃষ্ণকান্ত উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সে তাহার মনিবের সেবা করিয়াছে,—প্রভুসেবায় সে নিজের জীবনকে সম্পুর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে তাহার মনিবের ভর্ৎসনা লাভ করিয়াছে—

পাজি বেরো তুই আজই, দূর করে দিনু তোরে।

অথচ শত ভর্ৎসনায়ও মনিবের সেবায় তাহার ত্রুটি ঘটে নাই। শত লাঞ্ছনা সহিয়াও তাহার—

প্রসন্ন মুখ, নাহি কোনো দুখ, অতি অকাতর চিত্ত।

এই কৃষ্ণকান্তের মনিব শ্রীধামে গিয়া বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। তখন,—

বন্ধু যে যত স্বপ্নের মত বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ।
আমি একা ঘরে ব্যাধি খর শরে ভরিল সকল অঙ্গ॥

কিন্তু সেই বিপদের দিনে একমাত্র কৃষ্ণকান্তই তাহার মনিবের সেবা করিয়াছে—

নিশিদিন ধরে দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য।

তখন একমাত্র সে-ই—

মুখে দেয় জল শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত,
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাহি ঘুম, মুখে নাই তার ভাত।

এই পুরাতন ভৃত্য কৃষ্ণকান্তের সেবায় তাহার মনিব রোগমুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু সেই বিষম রোগে আক্রান্ত হইয়াছে কৃষ্ণকান্ত। মনিবকে সুস্থ করিয়া তুলিয়া সে পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীতে রহিয়া গিয়াছে তাহার নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তি আর অকপট অক্লান্ত সেবার আদর্শ।

রবীন্দ্রসাহিত্যে ভৃত্য আরও অনেক স্থানেই অন্তরের অসাধারণ ঐশ্বর্য্য ও মাহাত্ম্যের পরিচয় দিযাছে। কবির 'রাজা ও রাণী' নাটকের ভৃত্য শঙ্কর একাধারে বহুগুণে বিভূষিত। শৌর্য্য, বাৎসল্য, আত্মসম্মানবোধ, রাজভক্তি—বহু গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছে এই চরিত্রটিতে। সে দীন, কিন্তু হীন নহে। শঙ্কর নানা অত্যাচার সহ্য করিয়া কাশ্মীরের সৌভাগ্যরবির উদয় প্রতীক্ষা করিয়াছে, প্রহৃত হইয়াও বৃদ্ধ শঙ্কর তাহার প্রভু কুমারের সন্ধান বলিয়া দেয় নাই। শত নির্য্যাতনেও সে ভাঙিয়া পড়ে নাই, কর্ত্তব্যে অবিচলিতই থাকিয়াছে। সে যেন 'ভরতের রাজত্বে রামচন্দ্রের জুতোজোড়াটার মতো'—

কুমারকে সে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে অবহিত রাখিয়াছে। সুমিত্রাকে বলিযাছে—

বীরের স্বধর্ম্ম হতে
বিরত কোরো না তুমি আপন ভ্রাতারে,—

কুমারসেন শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আসিতেছেন—এ সংবাদে সে মর্ম্মাহত হইয়া বলিয়াছে—

চিরভৃত্য তব
আজি দুর্দ্দিনের আগে মরিল না কেন!

কিন্তু শেষে যখন সে দেখিয়াছে যে, কুমার বীরের ন্যায় মৃত্যুর মহিমায় সকল অপমান উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সকল বিরোধের অবসান ঘটাইয়াছেন, তখন গর্ব্বে আনন্দে তাহার মন ভরিয়া গিয়াছে। মৃত্যুর মাঝে প্রভুর মহিমা দেখিয়া সে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে, শোক করে নাই।

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন' গল্পের রাইচরণ চরিত্রটিও ত্যাগের মহিমায় ও বাৎসল্যে অতুলনীয় হইয়াই আছে। প্রভুপুত্রের প্রতি অনুরাগবশত সে নিজের ছেলেটিকে পর্য্যন্ত প্রথমে ভালবাসিতে পারে নাই। কিন্তু যখন মনে হইয়াছে যে, তাহার ভালবাসার আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাহার সেই প্রভুপুত্র বুঝি বা তাহারই ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে, তখন সে উহার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে এবং পূর্ব্বে উহার প্রতি উপেক্ষা অনাদর প্রকাশ করার জন্য অনুতাপ করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত প্রভুপুত্রবোধে নিজপুত্রকে সে তাহার প্রভুর হাতে

তুলিয়া দিয়াছে এবং প্রভুর জন্য একেবার রিক্ত নিঃস্ব হইয়া নিজেকে সে পৃথিবীবক্ষ হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে।

কবির নিজের ভৃত্য মোমিন মিঞা চৈতালি কাব্যের 'কর্ম্ম' কবিতায় মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। ভৃত্যরূপে যাহার সহিত কবির কেবল প্রয়োজনের সম্পর্ক ছিল, তাহার মধ্যে কবি আবিষ্কার করিয়াছেন চিরন্তন কালেব শোকার্ত্ত পিতাকে।

রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি', 'সামান্য ক্ষতি', 'কাঙালিনী' প্রভৃতি কবিতা সমাজের দুর্গত অত্যাচারিতদের প্রতি সমবেদনায় পরিপূর্ণ। দুই বিঘা জমির উচ্ছিন্ন মালিক উপেনের ব্যথা কবির মনকে স্পর্শ করিয়াছে। অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারে প্রপীড়িত কাঙালের অন্তর্বেদনা এই কবিতায় মূর্ত্ত হইয়া আছে। উপেনের বেদনার মধ্যে কবি মানুষের চিরন্তন বেদনাকে দেখিয়া বলিয়াছেন—

এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি।

'সামান্য ক্ষতি' শীর্ষক কবিতাতে দুর্গত ও অত্যাচারিত গৃহহীন পল্লীবাসীদের প্রতি কবির সহানুভূতি অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

কাশীর মহিষী করুণার হঠকারিতায় একখানি গ্রাম অগ্নিদগ্ধ হইয়া গেল। তখন—

গৃহহীন প্রজা দলে দলে আসে

এবং তাহারা কাশীরাজের কাছে—

দ্বিধাকম্পিত গদগদ ভাসে
নিবেদিল দুখ সঙ্কোচে ত্রাসে
চরণে করিয়া বিনতি।

রাজমহিষীর আচরণে রাজা ক্ষুব্ধ হইলেন এবং রাণীর মুখে যখন শুনিলেন যে—

গেছে গুটিকত জীর্ণ কুটীর।
কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর।
কত ধন যায় রাজমহিষীর
এক প্রহরের প্রমোদে।

তখন, বৎসরকালের জন্য রাণীকে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

যতদিন তুমি আছ রাজরাণী
দীনের কুটীরে দীনের কি হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি—

সুতরাং—

এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে কটি কুটীর হলো ছারখার
যতদিনে পার সে কটি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে।
বৎসরকাল দিলেম সময়
তার পরে ফিরে আসিয়া.
সভায় দাঁড়ায়ে করিয়া প্রণতি
সবার সমুখে জানাবে যুবতি
হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি
জীর্ণ কুটীর নাশিয়া।

কাশীরাজের এইরূপ পক্ষপাতশূন্য বিচারে ও গৃহহারাদের প্রতি রাজার সমবেদনায় কবি মুগ্ধ হইয়াছেন।

'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' কবিতায় একবস্ত্রা অতিদীনা ভিখারিণী নারীর দানই কবির চোখে শ্রেষ্ঠ দানের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। কারণ এ দান তাহার ভোগোদ্বৃত্ত যৎসামান্য দান নহে, ইহা তাহার সর্ব্বস্ব দান। সে তাহার একমাত্র বস্ত্র দান করিয়াছে মহৎ ত্যাগের আবেগে।

'পূজারিণী' কবিতায় পরিচারিকা শ্রীমতী সকল বিপদকে তুচ্ছ করিয়া বুদ্ধের স্তূপপদমূলে অর্ঘ্য রচনা করিয়াছে এবং মৃত্যুকে বরণ করিয়া মহৎ আদর্শের জন্য আত্মত্যাগের মহিমা অর্জ্জন করিয়াছে।

কবির কাবুলিওয়ালা গল্পের কাবুলিওয়ালা তুচ্ছ নয়। তাহার মধ্যেও কবি অপরূপের সন্ধান পাইয়াছেন, চিরন্তন প্রবৃত্তির বিকাশ দেখিয়াছেন এবং তাহার অন্তরের সেই কোমলতা ও মাধুর্য্যকে গল্পে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

ঐ কাবুলিওয়ালার বাহিরটা বড় রূঢ়, কর্কশ। কিন্তু বাহিরের পরিচয়ই যে মানুষের সব নয়, একথা কবি জানিয়াছিলেন। তাই দেখি, খুনের অপরাধে যে কাবুলিওয়ালার কারাবাস হইয়াছে, সেই কাবুলিওয়ালার মধ্যেও কবি চিরন্তন পিতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সুদূরপ্রবাসী এক পিতার কন্যাস্নেহ তাহার মধ্যে দেখিয়াছেন। কেবল অর্থের লোভে বা সওদা করিতে কাবুলিওয়ালা যে মিনির কাছে আসিত না, সে যে তাহার অন্তরের স্নেহ-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য মিনির

কাছে আসিত, একদিন এক মুহূর্ত্তে কবির কাছে তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। তখন মানুষ হিসাবে কাবুলিওয়ালাকে পৃথক বলিয়া মনে হইলেও অন্তরের বেদনা ও চেতনায় কবি তাহার সহিত এক হইয়া গিয়াছিলেন।

কবির কাব্যে গল্পে পতিতাও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। পতিতার মধ্যেও কবি দেখিয়াছেন—

জননীর স্নেহ, রমণীর দয়া
কুমারীর নব নীরব প্রীতি।

রূপোপজীবিনী বারবনিতার বাহিরের ছলনাময়ী মোহিনী মূর্ত্তির অন্তরালেও যে এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, তাহা কবি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পতিতার মধ্যেও তিনি নারীত্ব ও দেবীত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

'বিচারক' গল্পে কবি পতিতার মধ্যে অসামান্যতার সন্ধান পাইয়াছেন। হেমশশী একবার স্খলিত হইয়া তাহার পর হইতে 'ক্রমাগত নিজেকে বিচিত্র ছলনায় আচ্ছন্ন করিয়া হাস্য-মুখে অসীম ধৈর্য্য সহকারে নূতন হৃদয় হরণের জন্য মায়াপাশ বিস্তার করিয়াছে।' কিন্তু সে তাহার প্রথম প্রণয়ের অঙ্গুরীয়কটি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। তাহার আত্মা কলুষিত হইয়াছে, কিন্তু নষ্ট হয় নাই। প্রথম প্রেমের মর্য্যাদা সম্বন্ধে সে বিশেষ সচেতন।

সামান্য কুলে—পতিতার গর্ভে গোত্রহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণোচিত গুণ থাকিলে সে যে দ্বিজোত্তম রূপে

সমাদৃত হইবার যোগ্য একথাও কবিকর্ত্তৃক তাঁহার 'কথা' কাব্যের 'ব্রাহ্মণ' কবিতার মধ্যে ঘোষিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে পতিতা যেমন মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে, অস্পৃশ্য এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ও তাঁহার সাহিত্যে সেইরূপ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। কবি অস্পৃশ্য এবং অনুন্নতদিগের মধ্যেও অপরূপের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

অস্পৃশ্য জনসাধারণকে ঘৃণা করিয়া দূরে সরাইয়া মন্দিরে বসিয়া বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিলে সে প্রণাম যে জগৎ-নাথের চরণে পৌঁছায় না কবি তাহা বলিয়াছেন :—

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে ;
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে—
সবার পিছে, সবার নীচে,
সবহারাদের মাঝে।

কবি দরিদ্র জন-মজুরদের মধ্যে ভগবানকে বিরাজ করিতে দেখেন—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,—
পাথর ভেঙে কাটচে যেথায় পথ
খাটচে বারো মাস

রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে,
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি'
আয়রে ধূলার পরে।

কবির 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'য় চণ্ডালী প্রকৃতি নিজেকে অস্পৃশ্যা বলিয়া জানিয়া অভিমানভরে গাহিয়াছে—

যে আমারে পাঠালো এই
অপমানের অন্ধকারে,
পূজিব না পূজিব না, সেই দেবতারে পূজিব না।
কেন দিব ফুল, কেন দিব ফুল,
কেন দিব ফুল তারে ?
যে আমারে চিরজীবন
রেখে দিল এই ধিক্‌কারে।

এই যে অভিমানভরা কথা, ইহা ত' কেবল প্রকৃতির একা'র কথা নয়! ইহার মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতের অবহেলিত অবনমিত অস্পৃশ্যদের অন্তর্বেদনা ভাষা পাইয়াছে।

এই প্রকৃতিকে মানুষের মর্য্যাদা দান করেন বুদ্ধশিষ্য আনন্দ। প্রকৃতি একদিন কূপের ধারে জল তুলিতেছিল, এমন সময় বুদ্ধশিষ্য আনন্দ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া প্রকৃতির কাছে জল প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু প্রকৃতি যে চণ্ডালী—সে যে অস্পৃশ্যা এ কথাটি অনেকেই ইতিপূর্ব্বে তাহাকে জানাইয়া দিয়াছিল। তাই সে অতি বিনীতভাবে এবং কুণ্ঠার সঙ্গে গাহিল—

ক্ষমা করো মোরে, ক্ষমা করো মোরে,
আমি চণ্ডালের কন্যা—

মোর কূপের বারি অশুচি।
তোমারে দেব কূপের জল হেন পুণ্যের আমি
নহি অধিকারিণী।
আমি চণ্ডালের কন্যা !

কিন্তু প্রকৃতির সকল কুণ্ঠা দূব করিয়া আনন্দ গাহিলেন—

যে মানব আমি, সেই মানব তুমি কন্যা,
সেই বারি তীর্থবারি
যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে।

এ কথার পরে চণ্ডালী প্রকৃতির সকল দ্বিধা আর সঙ্কোচ দূর হইল। সে উল্লসিতা হইয়া আনন্দকে জল দান করিল। সেদিন প্রকৃতির অন্তরের সকল গ্লানি দূর হইয়া গেল। তাহার হৃদয়-বীণার তারে শততন্ত্রীতে ঝঙ্কার উঠিল—সে উৎফুল্ল হইয়া গাহিল—

ফুল বলে ধন্য আমি,
ধন্য আমি মাটির 'পরে,
দেবতা ওগো, তোমার সেবা
আমার ঘরে।
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
দয়া করে দাও ভুলিতে
নাই ধূলি মোর অন্তরে।

কবির কাছে এইভাবে পতিতা, অস্পৃশ্য—সমাজের অবহেলিত অবনমিত অত্যাচারিত ও সাধারণ স্তরের নরনারী সহানুভূতি এবং সমবেদনা লাভ করিয়াছে। কবি সকলকেই তাঁর সাহিত্যে মর্য্যাদা দান করেছেন। তাঁহার 'পলাতকা' কাব্যের সমস্তটাই এমনি অতি-সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনার প্রতি সমবেদনায় পরিপূর্ণ।

রাজা ও রাণী

রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী নাটকখানি তাঁহার অন্যান্য নাটকের মত ভাবপ্রধান নাটক, ঘটনাপ্রধান নহে। মুখ্য চরিত্র কয়টি idea personified। নাটকের উপকরণ সমাহৃত হইয়াছে চরিত্রসকলের মন্ময় জগৎ হইতে; Action বা কর্ম্মময়তা এবং ঘটনাস্রোত নাটকখানিতে মুখ্য নহে। ভাবের দ্বন্দ্বই নাটকখানিতে মুখ্য। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি। তিনি ছিলেন ভাব এবং আদর্শের রূপকার। তাই বাস্তবজীবনের ঘটনাপুঞ্জকে সাজাইয়া বা সেই ঘটনাধারার মধ্যে আঘাত-সংঘাত সৃষ্টি করিয়া তিনি তাঁহার সৃষ্টিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলেন নাই। কল্পনা লইয়াই ছিল তাঁহার বেসাতি, মনের লীলা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখানই ছিল তাঁহার সৃষ্টির অন্যতম বিশেষত্ব। এইজন্যই তাঁহার উপন্যাস, গল্প ও নাটক কেবল বিচিত্র ঘটনাসমন্বিত কাহিনীমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া যায় নাই। ঘটনার অন্তরালের সুরটুকুর প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত। তাই তাঁহার কোন কোন নাটকে কেবল অনুভূতির প্রকাশই প্রধান হইয়াছে, কোন কোন নাটকে কিছু পরিমাণ ঘটনা থাকিলেও তাহা একটা বিশেষ কোনরূপ ভাব বা আদর্শের উদ্বোধক হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাবকে রূপক রহস্যের সাহায্যে নাট্যরূপ প্রদান করাই রবীন্দ্রনাথের সাধনা ছিল। এইজন্যই ডক্টর টমসন রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন—

Tagore's dramas are vehicles of ideas, rather than expressions of action.

রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের দৈনন্দিন অসংখ্য ঘটনার উপর দিয়া চোখ বুলাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মন ডুবিয়া গিয়াছে সেই সকল ঘটনার অনেক নীচে। কুশলী কবি-নাট্যকার নাট্যসৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষীভূত করিবার প্রয়াসী হন নাই, তিনি অপ্রত্যক্ষকে অনুভবগম্য করিয়া তুলিতেই চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার নাটকগুলি তাই কোন বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া রূপ পায় নাই, একটি কোন ভাবকে আশ্রয় করিয়াই সেগুলি রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। এগুলি যেন গীতিকবিতার মতই একটি মাত্র রস বা অনুভূতি লইয়া পার্থিব স্থূলতা হইতে উর্দ্ধে মাথা তুলিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাজা ও রাণী নাটকের মধ্যে কিছু ঘটনা আছে। যেমন,—রাজকার্য্যে রাজা বিক্রমদেবের অবহেলার সুযোগ লইয়া রাণী সুমিত্রার আত্মীয়গণ, বিদেশী কাশ্মীরী কর্ম্মচারীরা রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের অর্থ শোষণ করিয়া তাহাদিগকে দুর্ভিক্ষে কাতর করিয়া তুলিয়াছে। নিপীড়িত প্রজাগণ ইহাতে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছে, তাহারা 'শাস্তর ছেড়ে অস্তর' ধরিবে সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে,—বিদ্রোহবহ্নির আভাস রাজ্যমধ্যে দেখা দিয়াছে। দেবদত্ত কর্ত্তব্যভ্রষ্ট কল্যাণধর্ম্মবিবর্জ্জিত রাজাকে কর্ত্তব্যে প্রণোদিত করিতে চাহিয়াছে। রাণী সুমিত্রাও রাজা বিক্রমদেবকে কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু কিছুই যখন কার্য্যকরী

হয় নাই, তখন সুমিত্রা বিক্রমদেবকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। রাজ্যের বিশৃঙ্খলা সংস্কার করিবার জন্য তিনি স্বীয় ভ্রাতা কুমারসেনকে জলন্ধর রাজ্যে যাইতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ রাজা বিক্রম কুমারসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। অতঃপর নাটকের ঘটনাস্রোত দ্রুত হইয়াছে। রাজা যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হইয়া কুমারসেনকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন, নানারূপ ধ্বংসলীলায় তিনি মাতিয়াছেন। কুমারের আত্মদানে, সুমিত্রার আত্মবলিদানে রাজার মোহমুক্তি হইয়াছে—নাটকখানি সমাপ্ত হইয়াছে।

নাটকখানির মধ্যে এইরূপ বিভিন্ন ঘটনাধারা থাকিলেও বহির্ঘটনার দ্বন্দ্ব অপেক্ষা ভাবের দ্বন্দ্ব দেখাইবার জন্যই নাটকটি রচিত হইয়াছে। অন্ধ আবেগ ও নিঃস্বার্থ ত্যাগের দ্বন্দ্ব দেখানোই নাটকখানির উদ্দেশ্য। একদেশদর্শী কর্ত্তব্যবিরহিত প্রেমের ব্যর্থতা প্রদর্শনই নাটকখানির মূলকথা।

রাজা ও রাণীতে সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে একটি বিরোধ। সে বিরোধ প্রেমের আদর্শ-সম্পর্কিত বিরোধ।

রাজা বিক্রমদেব তাঁহার মানসী প্রেমমূর্ত্তিকে দেহের মধ্যে খুঁজিয়াছেন। ভোগে নিমজ্জনস্পৃহা তাঁহার প্রবল, দেহ-সৌন্দর্য্যেই তাঁহাকে মুগ্ধ আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে,—তাঁহার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। প্রবল আসক্তির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সুমিত্রাকে পাইতে চাহিয়াছেন। রূপজ মোহ তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। রাজা বিক্রমের প্রেমে ছিল

ভোগাকাজ্ক্ষা, সুমিত্রার প্রেমে ছিল ত্যাগের সাধনা। একজনের অন্তর আসক্তির তৃষ্ণায় উদ্দাম, অন্যজনের চিত্ত ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল। রাজা চাহিয়াছেন সুধাময়ী রমণীকে,—মহিষীকে নয়; রাণী চাহিয়াছেন রূপমোহগ্রস্ত কর্ত্তব্যবিরহিত পুরুষকে নয়, রাজ্যেশ্বর রাজাকে। এইখানে উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে মিলনের অন্তরায়, উভয়ের মধ্যে জাগিয়াছে বিরোধ। চিত্তের অসীম দূরত্বের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে দুর্ব্বিষহ দ্বন্দ্ব। বিক্রমের প্রেম ঐহিক, তাঁহার প্রেম আসক্তিমূলক; তাহা যেমন সকাম, তেমনি প্রচণ্ড। কিন্তু সুমিত্রার জীবনাদর্শ, তাঁহার প্রেম ভিন্নরূপ। এ প্রেম অতীন্দ্রিয়। সে প্রেম ভোগস্পৃহাবর্জ্জিত, তাহাতে আসক্তি নাই, আছে আহুতি। সুমিত্রা ওয়ার্ডসওয়ার্থের Phantom of Delight নন, শেলীর Spirit of Delight-ও নন। তিনি

> A perfect woman nobly planned
> To warn, to comfort and to command.

তিনি কল্যাণী। যে প্রেম আপনার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া সহস্রের মধ্যে বিকিরিত হইতে চাহে, সুমিত্রার প্রেম সেই শ্রেণীর। তাঁহার প্রেমে আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা জড়িত ছিল, সে প্রেম যেমন গভীর, তেমনই শান্ত। কিন্তু বিক্রমের প্রেমে ছিল আত্মবিস্মৃতি। তাঁহার আত্মসর্ব্বস্ব প্রেম সুমিত্রাকে পাইবার প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল। বিক্রমের কামনা তরঙ্গ তুলিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত পদ্মটিকে দূরে সরাইয়া দিয়াছিল। মোহাবিষ্ট বিক্রমদেব দেহ-ভোগাকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রেমের চরি-

তার্থতা খুঁজিয়াছিলেন। ইহারই পরিণতি হইয়াছিল ট্রাজেডি। হৃদয়ের ধনকে দেহের মধ্যে ধরিয়া রাখিবার নিষ্ফল কামনাই রাজা ও রাণীর ট্রাজেডি।

রবীন্দ্রনাথের রাজা ও বাণী নাটকখানি কবির 'মানসী' কাব্যরচনার যুগে রচিত। এই যুগে কবিজীবনে একটা পরিবর্ত্তন সুচিত হইতেছিল। তখন প্রেম স্থূল কামনা ও ইন্দ্রিয়জ ভোগের রাজ্য ছাড়িয়া ক্রমেই অন্য লোকে অগ্রসর হইতেছিল, নর্ম্মসখী মানসীতে রূপান্তর লাভ করিতেছিলেন। কড়ি ও কোমলে যৌবনস্বপ্ন কবির সৌন্দর্য্যোপলব্ধির বাসনা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই যৌবনস্বপ্ন হইতে মুক্তির বাসনা মানসীতে আসিয়া তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। ভোগময় সৌন্দর্য্যে আচ্ছন্ন কবি এই যুগে এক অমৃত-উৎসের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। বাসনার বন্ধন হইতে মুক্তির আনন্দে কবিচিত্ত তখন উল্লসিত। তখন প্রেম ও সৌন্দর্য্য কায়ানৈকট্য হারাইয়া বস্তুনিরপেক্ষ ভাবলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বস্তুদেহ ভাবদেহের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। দৈহিক ভোগক্ষুধার মোহ যে ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণিক ভোগক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য যে এ জীবন নয়,—কবি তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রেমকে তিনি এ যুগে কল্যাণের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন। এই ভাবটি 'রাজা ও রাণী' নাটকে অতি স্পষ্ট হইয়াই রহিয়াছে।

রাজা ও রাণী নাটকের মধ্যে কয়েকটি পর্য্যায় আছে। নাটকের প্রথম দুই অঙ্ককে প্রথম পর্য্যায় বলিতে পারি। সেখানে নাটকের ঘটনার সূচনা ও দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত

দেখানো হইয়াছে। এই প্রথম পর্য্যায়ে অন্ধ আবেগবশে রাজা বিক্রম দুর্ব্বলচিত্ত, কর্ত্তব্যবিমুখ। ভোগাসক্তির মোহে তিনি কর্ত্তব্য ও কল্যাণের ক্ষেত্র হইতে ভ্রষ্ট হইতেছেন। রাজার কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া তিনি রাণীর রাজত্বে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ত্তব্য ও দায়িত্ববিরহিত প্রেম মেঘের মত তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার চিত্তকে বিকল করিয়াছে, বাজ্যের প্রতি সকল কর্ত্তব্য ভুলিয়া তিনি ভালবাসার নামে একটা মোহ-মরীচিকাব পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছেন। সুমিত্রা বাজার এই আত্মবিস্মৃতিতে লজ্জায় ম্রিয়মাণ, রাজার এই সংসারবিমুখ আত্মসর্ব্বস্বতাকে রাণী যথার্থ প্রেমের দ্যোতক বলিয়া মনে করিতে পারেন না। তিনি বলেন—

> শুনিয়া লজ্জায় মরি! ছি ছি মহারাজ,
> এ কি ভালবাসা। এ যে মেঘের মতন
> রেখেছে আচ্ছন্ন ক'রে মধ্যাহ্ন আকাশে
> উজ্জ্বল প্রতাপ তব। ... ...
>
> আমারে দিয়ো না লাজ,
> আমারে বোলো না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে।

রাজার প্রেম যে মত্ততার দ্বারা শাসিত, ব্যক্তিগত সুখ-সম্ভোগের বাসনায় খণ্ডিত রাণী তাহা বুঝিয়াছেন। এ প্রেমে নারীর নারীত্ব অপমানিত হয়। এমন প্রেম নারী কামনা করে না। রাণী সুমিত্রাও করেন নাই। বাস্তব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া রাজা বিক্রম সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেছেন, ইহা দেখিয়া সুমিত্রা ব্যথিতা হইয়াছেন এবং স্বামীকে সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অনেক

চেষ্টা করিয়াও যখন সার্থক হইলেন না তখন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কাশ্মীরে স্বীয় পিতৃরাজ্যে গিয়াছেন।

বিক্রম যখন দেখিলেন যে রাজ্যের যত সৈন্য, দুর্গ, কারাগার, যত শৃঙ্খল ও শক্তি সব কিছু দিয়া, কিংবা নিজের হৃদয়ের সমস্ত প্রেম উজাড় করিয়া দিয়াও সুমিত্রাকে ধরিয়া রাখা গেল ন', তখন তাঁহার সমস্ত স্বপ্ন টুটিয়া গেল। নিজেকে তিনি ফিরিয়া পাইয়া বলিলেন—

তবে দাও ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম্ম মোর
রাজধর্ম্ম ফিবে দাও।

তখন তাঁহার একে একে মনে পড়িতে লাগিল মানবের অবিশ্রাম সুখদুঃখ, বিপদ-সম্পদের কথা। তিনি বলিলেন—

আমারে পশ্চাতে ফেলে চলে গেছে চোর,
আপনারে পেয়েছি কুড়ায়ে।

এ সকল উক্তির পরে মনে হয় রাজার বুঝি সত্যসত্যই জাগরণ হইল, তিনি বুঝি বা সত্যই তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিলেন। তৃতীয় অঙ্ক হইতে নাটকের যে পর্য্যায় আরম্ভ হইল তাহাতে দেখি যে রাজাব ভুল ভাঙে নাই, তাঁহার প্রকৃত জাগরণ ঘটে নাই। এই পর্য্যায়ে যে রাজ্যের মধ্যে তিনি জাগিয়াছেন সে রাজ্য একটি ক্রুদ্ধ আহত অভিমানের রাজ্য, একটা সাময়িক উত্তেজনার রাজ্য ; নিজের উদগ্র অভিমানের মধ্যে নিজেকে উদ্দীপ্ত করিয়া রাখার রাজ্য। তিনি যেন এক মোহের আচ্ছন্নতার মধ্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আর এক আচ্ছন্নতার মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিলেন। চতুর্থ অঙ্কে রাণী

সুমিত্রা আসিয়াও এই নূতন আচ্ছন্নতার মধ্য হইতে আপন স্বামীকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। বরং অপমানিত হইয়া তাঁহাকে রাজার শিবিরদ্বার হইতে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। এত সহজে বিক্রমের ভুল ভাঙে নাই, জীবন ও প্রেমের রহস্য সহজে তাঁহার কাছে ধরা দেয় নাই।

ইলা ও কুমারের মুক্ত উন্নত প্রেমের আদর্শাভিঘাতে ও রেবতীর হিংস্র-প্রকৃতি দেখিয়া রাজা বিক্রমের চিত্তে পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। রেবতীর মুখাবয়বে নিজের প্রতিহিংসামূর্ত্তিটি দেখিয়া তিনি আপনাকে ফিরিয়া পাইলেন। চিত্ত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্রাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য তিনি আকুল হইলেন। আশান্বিত হইয়া দেবদত্তকে তিনি বলিলেন—

> বসন্ত না আসিতেই
> আগে আসে দক্ষিণপবন, তার পরে
> পল্লবে কুসুমে বনশ্রী প্রফুল্ল হয়ে
> ওঠে। তোমারে হেরিয়া আশা হয় মনে,
> আবার আসিবে ফিরে সেই পুরাতন
> দিন মোর, নিয়ে তার সব-সুখভার।

কিন্তু রাজা বিক্রমের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতা লাভ করিল না। কুমার আত্মবলিদান দিলেন। কুমারের এই আত্মাহুতির দুঃখ সুমিত্রার পক্ষে দুঃসহ হইল। তিনিও মৃত্যুকে বরণ করিলেন।

সুমিত্রার মৃত্যুতে বিক্রমের অন্তরে মর্ম্মন্তুদ জ্বালার সৃষ্টি হইল। দুঃখের মূল্যে বিক্রম সত্যকে লাভ করিলেন। বুঝিলেন, একদেশদর্শী কল্যাণবিরহিত যে প্রেম তাহার উপর বিধাতার

অভিশাপ বর্ষিত হয়। কর্ত্তব্য ও কল্যাণের আহ্বান যখন মানুষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন কল্যাণধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া প্রেমের মোহে আবিষ্ট হইয়া থাকিলে অভিশপ্ত হইতে হয়।

রাজা ও রাণী নাটকে দুটি কাহিনী আছে। একটি বিক্রম-সুমিত্রার কাহিনী। অন্যটি কুমার-ইলার কাহিনী। রবীন্দ্র-নাথের নিজের মত ছিল—কুমার ও ইলার প্রেমবৃত্তান্ত শোচ-নীয়রূপে অসংগত। অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা উহা নাটকখানির নাট্যপরিণতিকে বাধা দিয়াছে। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে—কুমার ও ইলার কাহিনীটি অতি মধুর। 'রাজা ও রাণী' নাটকে তাহা অপ্রাসঙ্গিক নহে। কাহিনীটির একটি নিজস্ব মাধুর্য্যও আছে।

বিক্রম-সুমিত্রার মিলনের অন্তরায়ের যে কারণ কবি-নাট্যকার তাঁহার রাজা ও রাণী নাটকের প্রথম দুই অঙ্কে সূচিত করিয়াছেন, নাটকের তৃতীয় অঙ্ক হইতে কুমার-ইলার কাহিনী উহার উপলব্ধিতে সহায়তা করিয়াছে। যে ভাবের দ্বন্দ্ব বিক্রম-সুমিত্রার কাহিনীর মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার প্রয়াস আছে, তাহা কুমার ও ইলার কাহিনী স্ফুটতর করিয়া তুলিয়াছে।

কুমার ও ইলার প্রেমে ভোগসর্ব্বস্বতা ছিল না। কামনার কলুষ কুমারের প্রেমকে স্পর্শ করে নাই। বিক্রমদেব তাঁহার প্রেমকে নিজের সমস্ত ভোগের গণ্ডি অতিক্রম করাইয়া মঙ্গল-কর্ম্মের অথবা কল্যাণের বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু কুমার তাহা পারিয়াছেন। দুঃখের অগ্নিপরীক্ষায়

দগ্ধ হইয়া প্রেমের পরীক্ষা দিতে হয়, জীবনের সম্যক পরিচয় লাভ করিতে হয়—কুমারের প্রেমে ও জীবনে উহার পরিচয় মিলিয়াছে। এই জন্যই তিনি নির্ব্বাসিত হইয়াও পূজিত সমাদৃত। পরাজয়ের মধ্যেও তিনি সর্ব্বজয়ী। কিন্তু বিক্রম জয়ী হইয়াও পরাজিত এবং সকল সাফল্যের অধিকারী হইয়াও ব্যর্থতার বেদনায় ভারাক্রান্ত। সঙ্কটবন্ধুর দুর্গমে প্রেমের জয়রথ চালনা করিয়াছেন কুমার; আর বিক্রমদেব প্রেমের সন্ধানে 'বাস্তব হ'তে ভ্রষ্ট হয়ে সত্যভ্রষ্ট হয়েছেন'। কুমারের প্রেমে দুর্ব্বলতা নাই, মোহাবেশ নাই, রূপতৃষ্ণায় তিনি অধীর নন। তাঁহার প্রেম সংযত, কল্যাণধর্ম্মের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শুধুমাত্র ইলাকে কেন্দ্র করিয়াই তাহা বিকাশ লাভ করে নাই। প্রজা ও রাজ্যের কল্যাণের ক্ষেত্রেও সে প্রেমের ধারা প্রবাহিত। কিন্তু ইহার বিপরীত ভাব বিক্রমদেবে। ভোগাসক্তির মোহ এবং প্রাবল্যহেতু তিনি ক্রমাগত নিজেকে কর্ত্তব্য ও কল্যাণের ক্ষেত্র হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছেন।

ইলার প্রেমও কুমারের প্রেমের মতই অবিচল একনিষ্ঠ। নিজের সকল ভোগ ও আনন্দ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া, সুমহান্ ত্যাগকে বরণ করিয়া নিজের এবং প্রিয়তমের জীবনকে সে ব্যক্ত করিয়াছে। সে যেন রামায়ণের ঊর্ম্মিলার মত রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাসের মধ্যে থাকিয়াও বিরহ-জ্বালা ভোগ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে; এবং ঐ বিরহের আগুনই তাহার প্রেমকে পবিত্র সুন্দর নির্ম্মল করিয়া দিয়াছে। তাহার প্রেমে (কুমারের প্রেমেও) আমরা আত্মার তপশ্চরণ লক্ষ্য

করিয়াছি। দেখিয়াছি,—সে প্রেম ত্রিচূড় রাজ্যের প্রথা অনুযায়ী পঞ্চবর্ষব্যাপী বিরহরজনীর যুগান্ত যাপন করিয়াছে, অন্তরে ভাবসম্মিলনের অমৃতনিষেকে ভাবী মিলনের আশাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

সুতরাং কুমার-ইলার এই প্রণয়-কাহিনীর দ্বারা বিক্রমের কাহিনী যে সম্যকরূপে প্রতিভাসিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে এ কথা বলা যায়। তাছাড়া প্রথমেই বলিয়াছি যে—এ কাহিনীর একটি নিজস্ব মাধুর্য্যও আছে। এই কাহিনীর মধ্য দিয়া উচ্চাঙ্গের লিরিক ভাবের বিকাশ নাটকমধ্যে ঘটিয়াছে। ইহাতে নাটকের ভাবরস ঘনীভূত হইয়া নাটকখানিকে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের মতই ভাবপ্রধান করিয়া তুলিয়াছে। এ কাহিনীটি যেন নাটকের ঘটনাধারার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত একটি গীতিকবিতা এবং ইলা যেন একটি লিরিক প্রতিমা। এ কাহিনী যেন কবির বিশ্রাম-মুহূর্ত্তের স্বপ্নরচনা। ঘটনার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহের মাঝখানে এই কাহিনী নাটকের মধ্যে গীতিকবিতার মধুরতা আনিয়া দিয়াছে। এ জিনিসটি না থাকিলে রবীন্দ্রনাটকের বিশেষত্বটুকুই থাকে না।

রাজা ও রাণী নাটকে লিরিক উপাদান যথেষ্টই আছে। ইহা অন্তর্দ্বন্দ্ব-প্রধান নাটক। কবি তাঁহার এই নাটকে সুমিত্রা ও বিক্রমের, কুমার ও ইলার অন্তরের তলদেশ পর্য্যন্ত আকস্মিক আলোকপাত করিয়া পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি নাটকোচিত কার্য্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের

অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। নাটকখানির মধ্যে বহুস্থানেই রাজার দীর্ঘ স্বগতোক্তি আছে,—সে-সকল স্থানে নাটকোচিত objective realism না ফুটিয়া lyric sentiment বা গীতোচ্ছ্বাস ফুটিয়াছে। নাটকখানির মধ্যে Action বা নাটকীয় কর্ম্মময় জীবনটুকুকে না ফুটাইয়া পাত্রপাত্রীর অন্তরস্থিত ভাবকেই কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; নাটকের পাত্রপাত্রীর হৃদয়ানুভূতি আমাদের গোচর করিয়াছেন। ইহাতে নাটকখানি ভাবের লীলাসঙ্গীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, কুমার এবং ইলার কাহিনী নাটকের সেই গীতোচ্ছ্বাসকে নিবিড়তব করিয়া তুলিয়াছে।

রাজা ও রাণী নাটকখানির পরিণতি ট্রাজেডিতে। বিক্রম ও সুমিত্রার বিপরীত জীবনবোধের সংঘাত হইতে সে ট্রাজেডির সৃষ্টি। কামনা-নিয়ন্ত্রিত প্রেম ও কল্যাণ-আদর্শ নিয়ন্ত্রিত প্রেমের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইতে রাজা ও রাণী নাটকের ট্রাজেডির উদ্ভব। নাটকের গোড়াতেই ট্রাজেডির বীজ উপ্ত হইয়াছে।

রাণীর ছিল অনুপম রূপ, অপূর্ব্ব জ্যোতির্মূর্ত্তি। রাজা সেই সৌন্দর্য্যকে কামনার দ্বারা অধিগত করিতে চাহিয়াছেন,—রাণীকে পাইতে চাহিয়াছেন লীলাসঙ্গিনীরূপে, রাণীর মর্য্যাদা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, বিশ্বের সকল সম্বন্ধ হইতে উৎখাত করিয়া। প্রেমের বিকার কামনা। কামনার বহ্নি দগ্ধ করিয়া প্রেমের সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হয়। বিক্রম

সেই পথে অগ্রসর হন নাই। ফলে প্রেমের আদর্শের অপমান ঘটিয়াছে এবং তাহা হইতে-সূচনা হইয়াছে মহাদুঃখের।

সুমিত্রা পরিপূর্ণ প্রেমের মূর্ত্ত প্রতীক, আলোকের দূতী। তিনি একাধারে প্রেয়সী ও কল্যাণী। রাজার একদেশদর্শী প্রেমে তিনি বাঁধা পড়েন নাই। স্বামীকে পূর্ণতর প্রেম ও মনুষ্যত্বের পথে দাঁড় করাইবার জন্য তিনি নানাপ্রকারে চেষ্টা করিয়াছেন,. কিন্তু প্যারেন নাই। অবশেষে স্বামীর মঙ্গলচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, তাঁহারই প্রেমে তিনি বিক্রমকে ছাড়িয়া গেলেন। ইহাতে রাজার অন্ধ আবেগ, তাঁহার অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণা রূপান্তর লাভ করিল এক অদ্ভুত বিজীগিষায়। প্রেমের আবেগ নিরুদ্ধ হইয়া তাহা হিংসার তাণ্ডবে পরিণত হইল। তিনি তখন চাহিলেন উদগ্র সংগ্রাম, 'রক্তে রক্তে মিলনের স্রোত,' 'অস্ত্রে অস্ত্রে সংগ্রামের ধ্বনি।' রাজার এই অন্ধ আবেগের মুখে আহুতি হইল কুমারসেন, ইলা ও সুমিত্রার। কুমারসেন, ইলা ও সুমিত্রাকে ভস্মীভূত করিয়া তবে রাজা বিক্রমদেবের বিকৃত প্রেমের দাবানল নির্ব্বাপিত হইল। নাটকের ট্রাজেডিতে পরিসমাপ্তি ঘটিল।

কিন্তু নাটকখানির ট্রাজেডির স্বরূপ কি? কুমারের মৃত্যু এবং ইলা ও সুমিত্রার মৃত্যুবরণই কি নাটকখানিকে দুঃখময় করিয়াছে? এই এতগুলি মৃত্যুই কি ট্রাজেডির কারণ? অবশ্য এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে 'রাজা ও রাণী' tragedy of blood। কিন্তু এই melodramatic ঘটনাকে ছাড়িয়া দিলেও ইহাতে ট্রাজেডির উপকরণ আছে।

যাহা কিছু সুন্দর মহৎ এবং উজ্জ্বল তাহার পতন ট্রাজেডির উপকরণ। সে দিক দিয়া দেখিতে গেলে কুমারের আত্মাহুতির মধ্যে ট্রাজেডির উপকরণ রহিয়াছে। তাছাড়া নাটকের নায়ক বিক্রমদেবের প্রতি নাটকের শেষভাগে পাঠকের সহানুভূতি জাগিতে থাকে। ইলার প্রেমতন্ময়তা দেখিয়া বিক্রমের অন্তর যখন প্রেমের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিয়াছে, তখন হইতে পাঠকের মনে বিক্রম সম্বন্ধে একটা সমবেদনা জাগে এবং সুমিত্রার মৃত্যুতে বিক্রমের ব্যর্থতার বেদনা পাঠকচিত্তকে আলোড়িত করিয়া তোলে। নাটকখানির পাঠ শেষ করিয়াও বিক্রমের মর্ম্মদাহ পাঠককে পীড়িত করিতে থাকে।

সুমিত্রা আত্মবলি দিয়া বিক্রমের অন্তরে যে জ্বালার সৃষ্টি করিয়া গেলেন, তাহা অনির্ব্বাণ শিখায় তাঁহার অন্তরের মধ্যে জ্বলিয়াছে। রাজার বাসনার চাঞ্চল্য সুমিত্রার মৃত্যুতে বেদনার তপস্যায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এইখানে নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

কুমারের মৃত্যুর পর সুমিত্রাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া বিক্রম-সুমিত্রার মিলন নাটকে দেখানো যাইতে পারিত। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে উভয়ের মিলনের মধ্যে চিরকালের জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া থাকিত, সে মিলনের মুখে হাসি থাকিত না। রাজা বিক্রম ও সুমিত্রার মধ্যে কুমারের মৃত্যু একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিয়াই রাখিত। এমতাবস্থায় ট্রাজেডিই নাটকখানির অপরিহার্য্য পরিণতি।

পাশ্চাত্ত্য প্রভাব

রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক পর্য্যায়ের কাব্য-নাটকগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাব পরিণত বয়সে রচিত কাব্য-নাটকাদির মধ্যে ইংরাজি সাহিত্যেব কবিদিগের—রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় যুগেব কবিগণের কল্পনাভঙ্গি ও বর্ণনারীতির আভাস মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে উনবিংশ ও বিংশ শতকের ইংরাজি সাহিত্যের ভাবৈশ্বর্য্য বিধৃত হইয়া আছে।

বিশ্বজীবনের সহিত, বিশ্বসাহিত্যের সহিত নিবিড়তম পরিচয় লাভের জন্য রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উন্মুখ। তাই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে, ইংরাজি সাহিত্যেব প্রভাবকে তিনি এড়াইতে পারেন নাই। সে প্রভাবকে তিনি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এই প্রভাব স্বীকরণ শক্তির গুণে রবীন্দ্রসাহিত্য অসাধারণ ঐশ্বর্য্য ও লালিত্য লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা উন্মেষের মূলে ইংরাজি সাহিত্য—বিশেষ করিয়া রোমান্টিক কবিকল্পনা প্রেরণা জোগাইয়াছিল। রোমান্টিক কবিকল্পনার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-নির্ঝরিণীকে অন্ধকার গিরিগুহা হইতে মুক্ত করিয়া মুক্ত আলো-বাতাসের জগতে আনিয়াছিল। শেলীর কল্পনার প্রভাবে তাঁহার ভাবের স্ফূর্ত্তি-সঞ্চার হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচনায় তাঁহার উপর শেলীর প্রভাব ছিল সব চেয়ে বেশি। এই প্রভাব রবীন্দ্রনাথের

পরিণত-প্রতিভার সৃষ্টির উপরও লক্ষিত হয়। শেলীর কবিধর্ম্ম ও রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্মে সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার মত। নিয়ত গতিশীলতা, পরিবর্ত্তনপ্রিয়তা দুই কবিরই কাছে প্রিয়। ঝড়, মেঘমেদুর আকাশ, নদীস্রোত, জলধারার তীব্র গতি—এ সকলের বর্ণনায় শেলীর অন্তরের উচ্ছ্বসিত আবেগ লক্ষিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাছেও এই সকল দৃশ্য বড় প্রিয়। পদ্মানদীর চাঞ্চল্যে ও গতিশীলতায় কবির গতিধর্ম্মী অন্তর সাড়া দিয়াছে, সায় দিয়াছে। আকাশে মেঘের খেলা, সূর্য্যের আলো শেলীর মতই রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রিয়। 'বর্ষশেষ' কবিতায় ঝড়ের বর্ণনায় কবি উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়াছেন—

বীণাতন্ত্রে হানো হানো খরতর ঝঙ্কার-ঝঞ্চনা,
তোলো উচ্চসুর।
হৃদয় নির্দ্দয়ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।
গাও গান প্রাণভরা ঝড়ের মতন উর্দ্ধবেগে
অনন্ত আকাশে।
উড়ে যাক্, দূরে যাক্ বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপুল নিঃশ্বাসে।

এই কথা বলিয়া কবি পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিবার ও পুরাতন সকল সঞ্চয় ত্যাগ করিবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। শেলীও বলিয়াছেন—

Make me thy lyre, even as the forest is :
What, if my leaves are falling like its own ?

* * *

Drive my dead thoughts over the universe,
Like withered leaves, to quicken a new
birth.
—*Ode to the West Wind.*

শেলীর অতীন্দ্রিয়তা রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে অপূর্ব্ব শ্রী এবং ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছে। শেলী তাঁহার Hymn to Intellectual Beauty কবিতায় দেখাইয়াছেন—রূপাতীত যে সৌন্দর্য্য তাহাকে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু উপভোগ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশী, বিজয়িনী প্রভৃতি কবিতায়ও ঠিক সেইরূপ কল্পনা বিকাশলাভ করিয়াছে দেখি। ভোগের দেবতা মদনকে তিনি নির্জ্জিত করিয়াছেন পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের পাদপীঠতলে। অবশ্য এ কল্পনার পশ্চাতে শুধু শেলীর অতীন্দ্রিয়তাবোধ নাই, বৈষ্ণব কবিদিগের প্রভাবও রহিয়াছে।

শেলী ভিন্ন, কীট্‌সের বর্ণনাভঙ্গিও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা যায়। কীট্‌সের ছিল শব্দচিত্র রচনার অসাধারণ শক্তি। শেলী ও কীট্‌সের বর্ণনাভঙ্গির পার্থক্য এইখানে। একজনের লক্ষ্য ছন্দস্পন্দের প্রতি,—অন্যজনের লক্ষ্য শব্দবিন্যাস, শব্দসঞ্চয়ের প্রতি; শব্দের সাহায্যে রূপকে বাঙ্ময় করিয়া তোলার প্রতি। শেলী কল্পলোকের অধিবাসী, কীট্‌স্ ধরণীর সম্পর্করহিত নিছক ভাববিলাসকে প্রশ্রয়-দানের বিরোধী। রবীন্দ্রনাথে এই উভয় কবির কল্পনাদর্শের সমন্বয় ঘটিয়াছে। 'ছবি ও গানের' যুগ হইতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করিয়া শব্দচিত্র রচনার প্রতি মনোযোগী হইয়াছিলেন। 'মানসী'র যুগে

নিখুঁতভাবে এই ছবি আঁকার ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ আয়ত্ত করিয়াছেন। সোনার তরী, কল্পনা, চিত্রা, বলাকা প্রভৃতি কাব্যের কবিতাসকল চিত্র ও সঙ্গীত দুইয়েরই এক অপরূপ সমন্বয়ে অপূর্ব্ব সৃষ্টিতে পরিণত। শেলী ও কীট্‌স্—এই দুই বিপরীতধর্ম্মী কবির কল্পনা ও বর্ণনার অভিনব সমন্বয় রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্য।

শেলীর মত রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্ম গতির মধ্যেই সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছে, তাঁহার কাব্যে সঙ্গীতের সুরমূর্চ্ছনা জাগিয়াছে শেলীর মতই। আর মনের অনুভূতিকে চিত্রে রূপান্তরিত করিবার ক্ষমতা অথবা ভাবকে দৃঢ়নিবদ্ধভাবে অল্পপরিসরের মধ্যে বাঁধিয়া দিবার ক্ষমতা তাঁহার কীট্‌সের মত—কালিদাসের সঙ্গেও এ বিষয়ে তাঁহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

ব্রাউনিং, টেনিসন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ম্যাথু আর্নল্ড, সুইন্‌বার্ণ প্রভৃতি কবিদের প্রভাবও রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার উপর অনুভূত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের অনন্তযৌবনা উর্ব্বশীর কল্পনার সঙ্গে সুইন্‌বার্ণের কল্পনার সাদৃশ্য রহিয়াছে। উর্ব্বশীর সর্ব্ব-সম্পর্কবিহীন রূপ কল্পনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশী!
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে
ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে,—
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিলো পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত
করি' অবনত।

কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র-বন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা।

সুইন্‌বার্ণও বলিতেছেন—

Before thee laughter, behind thee tears
of desire,

A better flower from the bud
Sprung of the sea without root
Sprung without graft from years.

রবীন্দ্রনাথ বাস্তবসম্পর্কশূন্য অতিরিক্ত মন্ময় (subjective) কল্পনার বিরোধী। এ বিষয়ে কীট্‌সের সঙ্গে তাঁহার কল্পনা-সাদৃশ্য ছিল, ব্রাউনিঙেও এই কল্পনাভঙ্গি বর্ত্তমান। আমাদের বৈরাগ্যপ্রপীড়িত তামসিক জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'প্রকৃতির পরিশোধ' নাট্যকাব্যের মধ্যে করিয়াছেন,—'সোনার তরী', 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি কাব্যের মধ্যেও পৃথিবীর মায়ামোহবন্ধন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া 'বৈরাগ্যসাধনে' তাঁহার অন্তর বিদ্রোহ করিয়াছে। তাই দেখি তাঁহার 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসী সন্ন্যাসের সাধনায় অনন্তকে উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া স্বস্তি বোধ করিয়াছে। সে বলিয়াছে—

যাক্ রসাতলে যাক্ সন্ন্যাসীর ব্রত,
দূর কর, ভেঙ্গে ফেল দণ্ড কমণ্ডলু!
হে বিশ্ব, হে মহাতরী, চলেছ কোথায়?
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে।

কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া—
আমিও চলিতে চাই উহাদের সাথে।

* * *

জগৎ তোমারে ছেড়ে পারিনে যে যেতে······

প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর মত রবীন্দ্রনাথও কখনো বেশি-দিন পৃথিবীর রূপরস-বর্ণগন্ধ হইতে, মানুষের স্নেহ-প্রেম-করুণা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারেন নাই। জন-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন কবির অন্তরে চিরদিনই একটা গভীর অতৃপ্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। কল্পনার জগতে বাস করার একাকীত্বে পীড়িত হইয়া আক্ষেপ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্ম্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূর বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত-তপ্তবায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি? ওরে তুই ওঠ আজি!

ব্রাউনিঙের Sordello-ও প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর মত বিশ্বের সহিত সম্পর্ক-স্থাপনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া বলিয়াছে—

Here is the crowd, whom I with freest heart
Offer to serve.

রোমান্টিসিজ্‌মের সকল লক্ষণ রবীন্দ্রনাথে সুপরিস্ফুট। রোমান্টিক কবিসুলভ কল্পনাসর্ব্বস্বতা রবীন্দ্রনাথে আছে, রোমান্টিক কবিদিগের মত বিশ্বপ্রকৃতির সহিত অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তাবোধ রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার অন্যতম বিশেষত্ব।

বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার কাছে অনন্ত সৌন্দর্য্য ও বিচিত্রতার উৎস, সেইজন্য তিনি নিজেকে সেই সৌন্দর্য্য-জগতের বুকে, বিচিত্রতার মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিবার ব্যাকুল বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার প্রকৃতিবিষয়ক কবিতায়। শেলী কীট্‌স্ বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি রোমান্টিক কবিগণ প্রকৃতির সহিত যে অন্তরঙ্গতা অনুভব করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রকৃতিবিষয়ক বহু কবিতায়ই সেইরূপ আত্মীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। তবে কোন একজন কবির কল্পনাভঙ্গি বা বর্ণনা-ভঙ্গির প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। বিভিন্ন কবির কল্পনাভঙ্গিকে আত্মসাৎ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-প্রকৃতিকে নূতনতর বর্ণে আঁকিয়াছেন। প্রকৃতিকে স্বতন্ত্ররূপে কল্পনা করিয়া ইহার চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন ; প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্র রূপের সন্ধান তিনি পাইয়াছেন, প্রকৃতির প্রাণস্পন্দন তিনি অনুভব করিয়াছেন। আবার নিজেকে বিশ্বসৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে স্থাপন করিয়া তিনি বিশ্বপ্রকৃতিকে উপলব্ধি করিয়াছেন। এইখানে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার ও উপলব্ধির স্বকীয়তা।

রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্ত্য কবিকল্পনার প্রভাব ছিল, কিন্তু সেই প্রভাবকে আত্মসাৎ করিয়া কবি নূতনতর কল্পনাভঙ্গির পরিচয় দিয়া নূতনতর কাব্যসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ক্রমাগত তিনি প্রভাবকে অতিক্রম করিয়াছেন। কীট্‌সের ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য্য-উপাসনা রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে 'কড়ি ও কোমলে'র যুগে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু ঐ 'কড়ি ও কোমলে'র যুগ হইতেই সে প্রভাব অতিক্রম করার প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথে দেখা

গিয়াছিল এবং মানসীর যুগে তিনি সে প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যবোধের, এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিলেন। শেলীর অতীন্দ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের কাব্যসৃষ্টিতে ছিল। কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের আগেই তিনি সে স্তর অতিক্রম করিয়াছিলেন। Browning-এর Intellectualism তিনি 'খেয়া'র যুগে পার হইয়াছেন। প্রভাবকে আত্মসাৎ করা এবং প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া কাব্যসৃষ্টিতে নূতন রূপ ও রূপকের সঞ্চার করাই ছিল রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষত্ব।

রবীন্দ্রনাথ ও জৰ্জ্জিয়ান কবিগণ

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে ধরণের কল্পনা ও কবিদৃষ্টি বৰ্ত্তমান তাহার সহিত ইংরাজি সাহিত্যের ব্রাউনিং, শেলী, বায়রন, কীট্‌স্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সুইন্‌বার্ণ, টেনিসন প্রভৃতি রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় যুগের কবিদিগের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু কয়েকজন আধুনিকতম ইংরাজ কবির কল্পনাদর্শের সহিত রবীন্দ্রনাথের কল্পনাদর্শের সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া যাই।

রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় যুগের কবিগণ কবির পূৰ্ব্বজ,—কবি তাঁহার বাল্যে ও যৌবনে তাঁহাদের কাব্য অনুশীলন করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ যুগের ইংরাজ কবিদিগের ভাব ও কল্পনাদর্শ কবির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজি কাব্যসাহিত্যে কয়েকজন জৰ্জ্জিয়ান কবির এমন কতকগুলি রচনা আছে, যেগুলি রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি বিখ্যাত কবিতার বহু পরে রচিত, অথচ উহাদের সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের বিজয়িনী কবিতাটি রচিত হয় ১৩০২ সালের ১লা মাঘ, অর্থাৎ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই কবিতায় কবি দেখাইয়াছেন যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য সকল প্রয়োজনের বাহিরে —সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি সত্তামাত্র। সে সৌন্দর্য্য অনবদ্য, পবিত্র, স্বর্গীয়।

কবিতাটির মধ্যে দেখি,—অচ্ছোদসরসীনীরে বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য দিয়া গড়া এক অনুপমা সুন্দরী নারীমূর্ত্তি স্নান করিতেছিল। তাহার চারিদিকে সুন্দর আবেষ্টন—

অচ্ছোদ সরসীনীরে রমণী যেদিন
নামিলা প্রথম স্নানের তরে, বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি। সমীরণ
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায় সঘন
পল্লবশয়নতলে, মধ্যাহ্নের জ্যোতি
মূর্চ্ছিত বনের কোলে, কপোতদম্পতি
বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চুচুম্বনের অবসরকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।

... ...

চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিণী
জলে স্থলে নভস্তলে। সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়ারৌদ্রকরে
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্ম্মরে
বসন্তদিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাসে আভাসে গুঞ্জনে
চমকে ঝলকে।

সেখানে প্রেমের ও সৌন্দর্য্যের সকল উপকরণই বিরাজ করিতেছিল—তরুতলে বকুলের রাশি ঝরিয়া পড়িতেছিল। কোকিলের কুহুতানে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল,

অদূরে সরোবরপ্রান্তদেশে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী কলনৃত্যে মাণিক্য-কিঙ্কিণী বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে বহিয়া চলিয়াছিল, আকাশে হংসবলাকা উড়িয়া যাইতেছিল কৈলাসের পানে, স্নিগ্ধ সুগন্ধে চারিদিক সুরভিত হইয়া উঠিয়াছিল। এমনিতর পরিবেশের মাঝে মদনের স্বভাবতঃই আবির্ভাব হয়। মদন বসন্তসখা সেখানে—

ব্যগ্র কৌতূহলে
লুকায়ে বসিয়া ছিল বকুলের তলে
পুষ্পাসনে, হেলায় হেলিয়া তরু পরে,
প্রসারিয়া পদযুগ নব তৃণস্তরে।

সে—

সহাস্য কটাক্ষ করি
কৌতুকে হেরিতেছিল মোহিনী সুন্দরী
তরুণীর স্নানলীলা।

এবং—

অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তার নির্ম্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি' লয়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।

তারপর যখন—

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ন কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী,—

তখন—

ত্যাজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি'
উঠিল অনঙ্গদেব।

কিন্তু পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া কামদেব তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ হইল। পরিপূর্ণ ঐ সৌন্দর্য্যমূর্ত্তির সম্মুখে ভোগের দেবতা মদন পরাভূত হইল। সৌন্দর্য্য দেখিলে মানবের মনে ভোগবাসনা জাগে। কিন্তু যিনি সকল সৌন্দর্য্যের আদি সৌন্দর্য্য, যিনি ইটার্নাল বিউটি,—তাঁহাকে দেখিলে লোভ ও বাসনা অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয়, তাঁহার দর্শনে চিত্ত নিমেষহীন হইয়া যায়, মন তৃপ্তি ও ভক্তিতে ভরিয়া যায়। সেইজন্য মদন অচ্ছোদসরসীনীরে স্নানরতা ঐ সুন্দরী রমণীর প্রতি পুষ্পশর সন্ধান করিতে উদ্যত হইয়াও শেষ পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্যের সেই মহিমান্বিত গম্ভীর নগ্নমূর্ত্তির সম্মুখে অবনত হইয়া আপনার ধনুর্ব্বাণ তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়াছে।—

নতশিরে পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার
তূণ শূন্য করি।

এবং তখন—

নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রশান্ত নয়ানে।

১৯১৩-১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত একটি জর্জ্জিয়ান কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই বিজয়িনী কবিতার অনুরূপ ভাব ও সৌন্দর্য্যতত্ত্বের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কবিতাটির নাম Children of Love—রচয়িতা হ্যারল্‌ড্ মন্‌রো। উক্ত কবিতায় কবি বর্ণনা করিয়াছেন যে—শিশু মদন

যিশুকে দেখিয়া তাহার বাণ নিক্ষেপ করিল। ইহাতে যিশুর হৃদয় বিদ্ধ হইয়া রক্তপাত হইল। তাঁহার চক্ষে অশ্রুধারা বহিল। তথাপি তিনি মদনকে কিছু বলিলেন না, কোন তিরস্কার করিলেন না। অশ্রুমোচন করিতে করিতে তিনি মদনের সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। মদন বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রবীন্দ্রনাথের বিজয়িনী কবিতায় পবিত্র স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের কাছে মদন পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, আর হ্যারল্ড্ মন্‌রোর Children of Love কবিতায় পবিত্র স্বর্গীয় প্রেমের কাছে কামনা বাসনা পরাভূত হইয়াছে। কামনা বাসনা যেমন পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী বিজয়িনীকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তেমনি যিশুর পবিত্র পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যকেও মদন স্পর্শ করিতে না পারিয়া পরাজয় মানিয়াছে।

চিত্রা কাব্যের প্রেমের অভিষেক কবিতাটি রচিত হয় ১৪ই মাঘ ১৩০০ সালে অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। কবিতাটির মধ্যে কবি ব্যক্তিগত প্রেম ও সৌন্দর্য্যকে বৃহত্তর প্রেমলীলার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিয়াছেন। জগৎসমক্ষে কবি যতই সামান্য হীন অথবা নগণ্য হউন না কেন, তিনি তাঁহার প্রিয়ার নিকটে রাজার তুল্য সমাদরের পাত্র। কবির মানসপ্রিয়া কবির ললাটে রাজটীকা পরান। কবি উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার প্রিয়াকে বলেন—

> তুমি মোরে করেছ সম্রাট্।
> তুমি মোরে পরায়েছ গৌরব মুকুট।

কবির নিজের দীনতা, হীনতা, ক্ষীণতা, ক্ষুদ্রতা সবই তাঁহার এই মানসপ্রিয়ার প্রসাদে অপরূপ হইয়া উঠে এবং কবি অনুভব করেন যে অতীত যুগের প্রেমিক-প্রেমিকাদের সুখদুঃখ-মিশ্রিত কাহিনী তাঁহার প্রেমিকার মধ্য দিয়াই যেন রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে। মানসপ্রিয়াকে ভালবাসিয়া, সেই প্রেমের নিবিড়তায় তিনি যেন বিশ্বের সমস্ত প্রেম-উৎফুল্ল এবং বিরহ-ম্লান হৃদয়ের ভাষার সন্ধান পাইয়াছেন।

সুভদ্রা ও অর্জ্জুন, নল ও দময়ন্তী, হর ও পার্ব্বতী,—সকলের প্রেমলীলার মধ্যে কবি নিজেরই প্রেমের বিকাশ দেখিতে পান। কবির মনে হয়—

হাত ধরে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্য্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয়যৌবনময় দেবতা সমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী—

ইহাই বৃহত্তর প্রেমের অনুভূতি। প্রিয়ার প্রেমে 'নিখিলের যতেক প্রণয়ী' সকলের সহিত কবির একাত্মতা জাগিয়াছে।

কবির এই বিশিষ্ট অনুভূতি এবং কল্পনাভঙ্গির সহিত ১৯১৮-১৯ সালের মধ্যে রচিত নিম্নলিখিত জর্জ্জিয়ান কবিতার ভাবানুভূতির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে—

Few are my books, but my small few have told
Of many a lovely dame that lived of old ;

And they have made me see those fatal charms
of Helen, which brought Troy so many harms ;
And lovely Venus, when she stood so white
Close to her husband's forge in its red light.
I have seen Dian's beauty in my dreams,
When she had trained her looks in all the
streams
She crossed to Latmos and Endymion.
And Cleopatra's eyes, that hour they shone
The brighter for a pearl she drank to prove
How poor it was compared to her rich love :
But when I look on thee, love, thou dost give
Substance to those fine ghosts, and make them
live.

—W. H. Davies, *Lovely Dames*

রবীন্দ্রনাথের মতই জর্জিয়ান কবি ডেভিস্ বলিয়াছেন যে অতীতকালে আবির্ভূত বিভিন্ন প্রেমিক-প্রেমিকার আনন্দোল্লাস এবং মিলনানন্দ তিনি অনুভব করেন তাঁহার মানসীর মধ্যে —তাঁহার প্রিয়ার মধ্যে কবি যেন হেলেন, ভেনাস্, ডায়না, ক্লিওপেট্রা প্রভৃতি অনুপমা সুন্দরীদের প্রেম প্রত্যক্ষ করেন।

মানসীর 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় (১২৯৬ সাল, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন প্রেম নিত্য, অখণ্ড। অনন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় উহা প্রবাহিত। যুগ-যুগান্তরে প্রত্যেক প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে একই প্রেমের পুনরভিনয়ই হইতেছে।

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শত রূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

... ...

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হ'তে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহ-বিধুর নয়ন-সলিলে মিলন মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে।

এই ভাবই কল্পনার 'স্বপ্ন' কবিতায় সুপরিস্ফুট। সেখানেও কবি তাঁহার জন্মজন্মান্তরের প্রেয়সীকে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন এবং অনুভব করিয়াছেন যে বর্ত্তমান হইতে অতীতে ও ভবিষ্যতে কবির সহিত কবিপ্রিয়ার অভিসার চলিবে, এ অভিসারের আরম্ভ অনাদি কালে এবং ইহার শেষ কোথায়ও নাই—এ প্রেম অশেষ।

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী-পারে
মোর পূর্ব্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে।

—কল্পনা : স্বপ্ন

অ্যালফ্রেড্ নয়েস্ নামক জর্জ্জিয়ান কবির The Progress of Love নামক কবিতায় অনুরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

In other worlds I loved you, long ago :
Love that hath no beginning, hath no end.
—Alfred Noyes, *The Progress of Love*

ইংরাজ কবি অ্যালফ্রেড্ নয়েস্ও রবীন্দ্রনাথের মত এখানে অনুভব করিয়াছেন যে প্রেম নিত্য অনাদি অনন্ত এবং সকল দেশের মাঝে সকল কালে কবিপ্রিয়া বর্ত্তমান ছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ১৪০০ সাল কবিতায় (১৩০২ সাল, ১৮৯৫ খ্রীঃ রচিত) কল্পনা করিতেছেন—'আজি হ'তে শত বর্ষ পরে'র পাঠকেরা কিভাবে তাঁহার কাব্যের রসগ্রহণ করিবে ? তখন ষড়্ঋতুর সৌন্দর্য্য বদলাইয়া যাইবে এবং অন্য কবির দ্বারা সে সৌন্দর্য্য হয়ত ভিন্নরূপে বর্ণিত হইবে। তথাপি আজিকার বসন্তাগমে কবির মনে যে আনন্দহিল্লোল জাগিয়াছে সেই আনন্দ তিনি ভবিষ্যৎকালীন শত বৎসর পরের পাঠক ও কবির উদ্দেশে পাঠাইয়া দিবার জন্য উৎসুক।

দূর অতীতের সহিত কবি যেমন মিলনের গ্রন্থি বাঁধিয়াছেন তেমনি দূর ভবিষ্যতের সহিতও তিনি নিজেকে গ্রন্থিবন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য ব্যাকুল।—

আজি হতে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি' আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।

আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ,
আজিকার কোন ফুল, বিহঙ্গের কোন গান,
আজিকার কোনো রক্তরাগ,
অনুরাগে সিক্ত করি' পারিব কি পাঠাইতে
তোমাদের করে
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।

... ...

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।
এখন করিছে গান সে কোন নূতন কবি
তোমাদের ঘরে।
আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।
আমার বসন্ত গান তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে—
হৃদয়-স্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,
পল্লবমর্ম্মরে,
আজি হতে শত বর্ষ পরে।

রবীন্দ্রনাথের এই ১৪০০ সাল কবিতাটি রচনার বহু পরে To A Poet A Thousand Years Hence নামে একটি কবিতা জার্জ্জিয়ান কবি James Elroy Flecker কর্ত্তৃক রচিত হয়। কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।—

I who am dead a thousand years,
And wrote this sweet archaic song

Send you my words for messengers
The way I shall not pass alone.
O friend unseen, unborn, unknown,
Student of our sweet English tongue,
Read out my words at night alone ;
I was a poet, I was young.
Since I can never see your face,
And never shake you by the hand,
I send my soul through time and space
To greet you, you will understand.
—James Elroy Flecker.

কল্পনার 'অশেষ' কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালে অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনদেবতার আহ্বান শুনিতে পাইয়াছেন। জীবন-সন্ধ্যায় সকল কাজ সাঙ্গ করিয়া কবি যখন বিশ্রামোন্মুখ তখন নূতন কল্পনারাজ্যে প্রধাবিত হওয়ার জন্য জীবনদেবতার ব্যাকুল আহ্বান আসিয়া পৌঁছিয়াছে কবির কাছে—

আবার আহ্বান।
যত কিছু ছিল কাজ সাঙ্গ তো করেছি আজ
দীর্ঘ দিনমান।
জাগায়ে মাধবীবন চলে গেছে বহুক্ষণ
প্রত্যূষ নবীন।
প্রখর পিপাসা হানি' পুষ্পের শিশির টানি'
গেছে মধ্যদিন।

মাঠের পশ্চিম শেষে অপরাহ্ণ ম্লান হেসে
হোলো অবসান।
পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে
তবুও আহ্বান !

জীবনদেবতার এই আহ্বানে কবি আর শেষ পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতে পারেন নাই। তিনি পুনরায় তাঁহার কাব্যবীণায় নব নব ধ্বনি তুলিয়াছেন—উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া তিনি বলিয়া উঠিয়াছেন—

তোমার আহ্বান-বাণী সফল করিব রাণী
হে মহিমাময়ী !

ইহার সহিত ১৮১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত নিম্নলিখিত জর্জ্জিয়ান্ কবিতাটি তুলনীয় :—

Old and alone, sit we,
Caged, riddle-rid men ;
Lost to earth's 'Listen !' and 'see !'
Thought's 'Wherefore ?' and 'When ?'
Only·far memories stray
Of a past once lovely, but now
Wasted and faded away,
Like green leaves from the bough.
Vast broods the silence of night,
The ruinous moon
Lifts on our faces her light,
Whence all dreaming is gone.
We speak not ; trembles each head ;

In their sockets our eyes are still ;
Desire as cold as the dead ;
Without wonder or will.
And one, with a lanthorn, draws near,
At clash with the moon in our eyes ;
'Where art thou ?' he asks. 'I am here',
One by one we arise.
And none lifts a hand to withhold
A friend from the touch of that foe :
Heart cries unto heart. 'Thou art old !'
Yet reluctant, we go.

—Walter de la Mare, *The Old Men.*

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় (১৩০০ সাল, ইংরাজি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) জীবনদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি কবিকে কোন্ নিরুদ্দেশ পথে কোথায় লইয়া যাইতেছেন—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি ?
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী
তুমি হাসো শুধু মধুরহাসিনী,
বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে তোমার মনে।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগনকোণে।
কী আছে হোথায়, চলেছি কিসের অন্বেষণে॥

Georgian কবি Francis Brett Young-এর মনেও

এমনিতর নিরুদ্দেশ যাত্রার অনুভূতি জাগিয়াছে। তিনিও তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

Whither, O my sweet mistress, must I
follow thee ?
For when I hear thy distant footfall nearing,
And wait on thy appearing,
Lo ! my lips are silent : no word come
to me.
Whither, O divine mistress, must I then
follow thee ?
Is it in love, say is it only in death
That the spirit blossometh,
And words that may match my vision
shall come to me ?
—Francis Brett Young, *Invocation.*

বলাকার 'নবীন' কবিতাটিতে (১৩২১ সাল, ইং ১৯১৪) রবীন্দ্রনাথ নবীনের জয়গান গাহিয়াছেন। নবীন কোনরূপ বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া নিজের নবীনত্বের অমর্য্যাদা করিবে না— আপদ বিপদ দেখিয়া নবীনের প্রাণে ভয় সঞ্চার হয় না। বিপদ আপদ এবং বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলাতেই সে নিজের জীবনকে সার্থক মনে করে—

আপদ আছে, জানি আঘাত আছে
তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে,—

জর্জ্জিয়ান্ কবি অ্যালফ্রেড্ নয়েস্‌ও নবীনের এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

Never was mine that easy faithless hope
Which makes all life one flowery slope
To Heaven ! Mine be the vast
assaults of doom,
Trumpets, defeats, red anguish, age-long
strife,
Ten million deaths, ten million gates to life,
The insurgent heart that bursts
the tomb.

মানবমনের কতকগুলি চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা আছে। পৃথিবীর সকল দেশে ও সকল কালে সেই সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা মানবমনে জাগিয়াছে। কবিগণ যখন এই চিরন্তন অনুভূতিকে, চিরন্তন হর্ষ শোক আশা উৎসাহকে ভাষা দিতে অগ্রসর হন, তখনই তাঁহাদের মধ্যে ভাব ও কল্পনাদর্শের সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় মানবমনের চিরন্তন অনুভূতি ও আকুতি মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাঁহার পরবর্ত্তী কালে রচিত অনেক ইংরাজি কবিতার সহিত কবির কল্পনাভঙ্গির সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা চিরন্তন অনুভূতি ও আকুতির প্রতিরূপ। ইংরাজিতে যাহাকে বলা হয় universal appeal—তাহা রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার মধ্যে আছে বলিয়াই পরবর্ত্তী কালে প্রকাশিত পাশ্চাত্ত্যের কবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের কল্পনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রকাব্যে রোমান্টিসিজ্‌ম্‌

রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ কবিমনের একটি বিশেষ ধর্ম্ম, কবিমানসের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। রোমান্টিক মনোবৃত্তির প্রধান লক্ষণ কল্পনা-প্রবণতা। কল্পনাশ্রয়ী বলিয়াই রোমান্টিক কবিগণ সীমার গণ্ডিকে উত্তীর্ণ হইয়া অসীমের দিকে নিজেদের চিত্তকে ব্যাপ্ত করেন। কল্পনাবলে ইঁহারা কখনো বর্ত্তমানের বন্ধনবিমুক্ত হইয়া অতীতের স্মৃতিতে বিভোর হন, কখনো অনাগতের মোহে মুগ্ধ হন। কল্পনাপ্রবণতার অসাধারণ বিকাশ ওয়ার্ডসওয়ার্থের মধ্যে হইয়াছিল বলিয়াই অতি সাধারণ বস্তুতে তিনি অসাধারণ গৌরব-মহিমা খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, শেলী অনাগত জগতের কল্পনায় বিভোর হইয়াছিলেন। রোমান্টিক কবিরা অপরিচিত অজানার প্রতি একটা মোহময় আকর্ষণ অনুভব করেন। ইহাই কবিচিত্তকে ক্রমাগত সীমা হইতে অসীমের অভিমুখে, রূপের জগৎ হইতে অরূপলোকে, ইন্দ্রিয়জগৎ হইতে অতীন্দ্রিয়লোকে, জানা হইতে অজানায় আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। রোমান্টিক মনোবৃত্তির মূলে থাকে অপার অসীম বিস্ময়বোধ। জল স্থল অন্তরীক্ষের যাবতীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া রোমান্টিক কবিমনের বিস্ময় হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। বিশ্বপ্রকৃতি ও বসুন্ধরার পানে চাহিয়া তাই কবি বলেন—

যত অন্ত নাহি পাই তত জাগে মনে
মহারূপরাশি ;

তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা
যত কাঁদি হাসি।
—মানসী : প্রকৃতির প্রতি

এবং

সকলি রহস্যপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ
বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায় ;
সোনার তরী : বসুন্ধরা

রোমাণ্টিক কবিগণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, বুদ্ধি অপেক্ষা অনুভূতিতে ইঁহারা বেশী আস্থাবান্। তাই পৃথিবীর দীনতম বস্তুকেও ইঁহারা অসামান্যের বিকাশমন্দিররূপে দেখেন, পতিত ও ব্যথিত-জনের হৃদয়কন্দরে ইঁহারা স্বর্গীয় মাধুর্য্য দেখেন। পতিতা নারীর মধ্যেও ইঁহারা 'জননীর স্নেহ, রমণীর দয়া, কুমারীর নব নীরব প্রীতির' সন্ধান পান। রোমাণ্টিক কবি অতীতের মধ্যে সীমাহীন শান্তির সন্ধান পান, অতিপরিচিত বর্ত্তমান অপেক্ষা অতীতের অবগুণ্ঠিত শিখরের প্রতি তাঁহাদের বেশি আকর্ষণ। প্রকৃতির রূপরস গন্ধস্পর্শের মধ্য দিয়া ইঁহারা এক আমন্ত্রণলিপি পান। বার বার সে চিঠি পড়িয়াও তাঁহাদের মন মানে না। ফিরিয়া ফিরিয়া ইঁহারা সে লিপি পাঠ করিয়া থাকেন।

রোমাণ্টিক কবি মানুষের মর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন, প্রকৃতির সহিত মানবমনের নিগূঢ় সম্বন্ধ ইঁহাদের নিকট সুস্পষ্ট। দৃশ্যমান্ বিচিত্র এই রূপজগতের অন্তরালে যে অদৃশ্য এক জগৎ অবস্থিত, রোমাণ্টিক কবির দৃষ্টি সে সম্বন্ধে সজাগ। কাছের জিনিসকে কাছে কাছে রাখিলে, তাহার সবটুকু বুঝিয়া ফেলিলে,—অথবা

একটা বিশেষ বিগ্রহের মধ্যে তাহাকে স্পষ্ট করিয়া ধরিলে তাহার সৌন্দর্য্য রহস্য রোমান্স কিছুই থাকে না। তাই কল্পনাপ্রবণ রোমান্টিক কবিমন মধ্যাহ্নের দীপ্তসূর্য্যের ছটায় সৌন্দর্য্যকে দেখেন না, গোধূলির আলোছায়ার আড়ালের সৌন্দর্য্যই তাঁহাদের কাছে বেশি মধুর। অতীত বর্ত্তমান এবং অনাগত রোমান্টিক কল্পনায় পৃথক নয়, সুখ-দুঃখ জীবন-মৃত্যু কোনটাই একান্ত বা পরস্পরবিরোধী নয়।

রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবি। তিনি তন্ময় ভাবুক। বাহিরের রূপরস বর্ণগন্ধময় পৃথিবীকে তিনি 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' রচনা করিয়াছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতই The light that never was on sea or land-এর দ্বারা সৃষ্টিকে উদ্‌ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন। মনের রঙে তিনি যখন এই ভুবনের দৃশ্যাবলীকে রাঙাইয়া তোলেন তখন বস্তুবিশ্ব অবাস্তব-মনোহর মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে। কবির ধর্ম্ম—

নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্তকায়া
বাসন্তীবাস পরা।
ধরণীর জলে গগনের গায়
সাগরের জলে অরণ্যছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙীন করিয়া দিব।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ইউরোপীয় রোমান্টিসিজ্‌মের সকল লক্ষণই আছে। সুগভীর অতীতপ্রিয়তা, কল্পনাপ্রবণতার

অসাধারণ বিকাশ, বিস্ময়বোধ, পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা, অপূর্ণতার বেদনা, সামান্যের মধ্যেও অসামান্যের সাক্ষাৎলাভ, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের উপলব্ধি—এ সকলই রবীন্দ্রনাথে আছে। ক্ষুদ্র ফুলে কবি অসীম অখণ্ড ও পূর্ণের আভাস পাইয়াছেন—

ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে
নিয়ে আসে স্বাধীনতা,—গভীর আশ্বাস।
ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদি কারো পড়ে মনে
বৃহৎ জগৎ আর বৃহৎ আকাশ।
—কড়ি ও কোমল : ছোট ফুল

ইংরাজ কবি শেলীর মত তিনি এক কল্পনার জগতে, আদর্শলোকে মাঝে মাঝে ভ্রমণ করিয়াছেন,—আবার কীট্‌সের মত সেই আদর্শলোক হইতে বিদায় লইয়া ধরণীর বুকে ফিরিয়াছেন এবং তখন ধরণীর ধূলিকণাতে পর্য্যন্ত অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি ধূলিময় এই ধরণীকে ভালবাসিয়াছিলেন, ধূলির আসনে বসিয়া ধ্যানচোখে ভূমাকে দেখিয়াছিলেন। তাই শেলীর মত তাঁহার কল্পনা শুধুমাত্র অতীন্দ্রিয়তাতেই পর্য্যবসিত হইয়া যায় নাই। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিসিজ্‌ম্ বাস্তবসম্পর্কশূন্য নহে—বাস্তবের মধ্যে তিনি বাস্তবাতীতকে দেখিয়াছেন।

বন্ধু তুমি জান
ক্ষুদ্র যাহা ক্ষুদ্র তাহা নয়।
সত্য যেথা কিছু রহে
বিশ্ব সেথা রয়।

এই যে লজ্জাবতী লতা মুদে আছে লাজে
পড়িবে তুমি এরি মাঝে
জীবন-মৃত্যু-ঝটিকার বারতা
আমার লজ্জাবতী লতা।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখিত হইলেও একথা কবির নিজের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সামান্য একটি লজ্জাবতী লতার মধ্যে তত্ত্বসন্ধানী বৈজ্ঞানিকের মতই কল্পনাপ্রবণ কবি অনন্ত শক্তি ও সৌন্দর্য্যকে দেখিতেন।

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনার সহিত পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক কল্পনার সাদৃশ্য থাকিলেও, রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনার স্বকীয়তা বা মৌলিকতা এবং বৈশিষ্ট্য ছিল। রবীন্দ্রনাথে রোমান্টিসিজ্‌ম্ কেবল একটি বিশেষ দষ্টিভঙ্গি নহে, ইহা তাঁহার মর্ম্মের বিশ্বাস, ইহা তাঁহার আন্তর সত্তার সহিত একান্তভাবে বিজড়িত। কোন কোন কবির মধ্যে দেখা যায় যে তাঁহাদের জীবনসাধনা ও কাব্যসাধনা এক হইয়া মিলিয়া গিয়াছে—কাব্যানুভূতি ও জীবনানুভূতি এক হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহারই দৃষ্টান্ত। রোমান্টিসিজ্‌ম্ রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্ম্ম বা কাব্যধর্ম্ম। ইহা তাঁহার জীবনের গভীর বিশ্বাস ও সংস্কার। তিনি কোনো বিশেষ দার্শনিক বা রসতাত্ত্বিক মতবাদ অবলম্বন করিয়া কাব্যসৃষ্টি করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে স্বকীয়,—ইহা তাঁহার স্বধর্ম্ম, ব্যক্তিত্বেরই অভিব্যক্তি। ইহাই তাঁহার faith বা culture উভয়ই, ইহাই তাঁহার জীবনবেদ।

প্রকৃতিকে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া উপলব্ধি করিয়াছেন সেখানে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনার স্বকীয়তা সব চেয়ে বেশি প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃতিকে তিনি পাশ্চাত্ত্যের রোমান্টিক কবিদিগের মত কেবলমাত্র চেতনাময়ী বলিয়া মনে করেন নাই। প্রকৃতিকে তিনি আপনার অন্তরের সকল চেতনা ও বেদনার সহিত একাত্ম করিয়া লইয়াছিলেন। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তিনি এক অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা বোধ করিয়াছেন। এই পৃথিবীর সহিত, তরুলতা পশু পাখী পতঙ্গের সহিত, লক্ষযোজন দূরের সূর্য্য চন্দ্র তারার সহিত তাঁহার জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ। একদিন তিনি ইহাদের সহিত একাত্ম হইয়াই ছিলেন। আজ তিনি ইহাদিগের নিকট হইতে, নিখিলের ঐ প্রাণপ্রবাহ, সৌন্দর্য্যপ্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সে স্মৃতিটুকু কবিমন হইতে লুপ্ত হয় নাই; তাই মধ্যাহ্নে প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের মাঝে সমাসীন হইয়া কবির মনে হয়—

আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে।
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে ; ধরণীর বক্ষতলে
পশু পাখী পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্ব্বজন্মে,—জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে-স্থলে মাতৃস্তনে শিশুর মতন,
আদিম আনন্দ-রস করিয়া শোষণ॥

—চৈতালি : মধ্যাহ্ন

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মন এই বিশ্বজগতের সহিত এক নিগূঢ় যোগে যুক্ত ছিল। এই যে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবিমনের যুগ-যুগান্তরের জন্মজন্মান্তরের ঐক্যবোধ—যে বোধে কবির মনে হইয়াছে যে মানবের জীবনযাত্রা আজিকার নয়, জড়-জগতেও এই প্রাণ স্পন্দিত হইয়াছিল, উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণিজগতেও এই একই প্রাণ অভিব্যক্তির স্তরে স্তরে পা ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে—উহাই রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিসিজ্‌মে এক স্বাতন্ত্র্য আনিয়া দিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্যের রোমান্টিক কল্পনার সহিত রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনার সর্ব্বপ্রধান প্রভেদ হইতেছে—কবির এই অখণ্ড দৃষ্টিতে। যে সৌন্দর্য্য পৃথিবীর বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে বিধৃত তাহাকে তিনি একদিকে খণ্ডভাবে উপলব্ধি করেন,—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

* * * * *

অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চল-গামিনী।

আবার যাহা রূপে রসে গানে অথবা অসংখ্য ছন্দ-ভঙ্গিতে ইন্দ্রিয়ের গোচর রহিয়াছে, তাহা ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া, দেশকালের অতীত হইয়া কবির মানসবৃন্তে বিধৃত।

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির যামিনী।

* * * *

নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।

কবির দৃষ্টিতে বাহিরে যিনি বিচিত্র চঞ্চল, অন্তরে তিনিই এক অচপল; অন্তরের প্রশান্ত একই বাহিরের বিচিত্ররূপিণী।—এই অখণ্ড সৌন্দর্য্যই কবির বিশ্বসোহাগিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী, মানসসুন্দরী জীবনদেবতা। শস্যশীর্ষের শিহরণে, সিন্ধুতরঙ্গের ছন্দে অনন্ত সৌন্দর্য্যের খণ্ড প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ যেমন দেখিয়াছেন, তেমনিই আবার একটি অখণ্ড মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর ধ্যান করিয়া তবে কবি তৃপ্তি মানিয়াছেন। এই অখণ্ড সৌন্দর্য্যবোধই রবীন্দ্র-নাথের রোমান্টিক কল্পনার অন্যতম বিশেষত্ব।

অচলায়তন নাটকে গান

রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। অনির্ব্বচনীয়কে প্রকাশের জন্য,—অসীমকে, সত্য শিব সুন্দরের স্বরূপকে অনুভূতিগোচর করাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ নাটকরচনার ক্ষেত্রে রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার করিয়াছিলেন। বস্তু বা ঘটনাকে কেবল কথার জাল বুনিয়া ফুটাইয়া তোলা যায়, কিন্তু বস্তু ও ঘটনার অতীত প্রদেশে পৌঁছিয়া পরিপূর্ণতার সম্মুখীন হইতে হইলে সুরের তরী বাহিয়া পাড়ি জমাইতে হয়, কারণ কথাটা সীমার—সুরটা অসীমের। 'সুর যেখানে কথাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, কথা সেখানে পায়ে হেঁটে যেতে পারে না।'

গানের সুর অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিকে উন্মীলিত করে, মন বা বুদ্ধি দিয়া যাহা অপ্রাপণীয়, গানে তাহার নাগাল পাওয়া যায়। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের রূপক প্রতীক নাট্যসমূহে গানের বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

কবি পূর্ণতার উপাসক, বস্তুজগতের অপূর্ণতা তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছে। তিনি চিরদিন পৃথিবীর সমস্ত খণ্ডতা ক্ষুদ্রতা সীমাবদ্ধতার ঊর্দ্ধে উপনীত হইবার প্রয়াসী ছিলেন। কবির রূপক প্রতীক নাটকের গানগুলি বস্তুজগতের অপূর্ণতা, পৃথিবীর খণ্ডতা ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতার ঊর্দ্ধে উপনীত হইবার

সহায়ক। রবীন্দ্রনাট্যের গানগুলি অগোচরকে অনুভূতিগোচর করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অচলায়তন নাটকে, রক্তকরবীতে, মুক্তধারায়, ফাল্গুনী প্রভৃতিতে গান আছে। এই সকল নাটকের গান প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন লোকগুলিকে পরিপূর্ণতার বাণী শুনাইয়াছে, অথবা যন্ত্রবদ্ধ মানুষের মনকে আনন্দের চাঞ্চল্যে ভরিয়া তুলিয়াছে।

অচলায়তন নাটকে অনেকগুলি গান রহিয়াছে। রক্তকরবী নাটকখানি যেমন প্রাণ ও যন্ত্রের দ্বন্দ্ব, অচলায়তন নাটকখানি তেমনি প্রাণ ও মন্ত্রের দ্বন্দ্ব। রক্তকরবী নাটকে যেমন নন্দিনীর গান আছে, বিশু পাগলের গান আছে, ফসলকাটার গান আছে,—আর সেই গানগুলি যেমন যক্ষপুরীর যন্ত্রবদ্ধ মানুষগুলাকে মুক্তির বাণী শুনাইয়াছে, অচলায়তন নাটকেও তেমনি পঞ্চকের গান আছে, দাদাঠাকুরের গান আছে। সেই সকল গান ঐ মন্ত্রের রাজ্যে একটা নূতন জাগরণের সাড়া সৃষ্টি করিয়াছে।

অচলায়তনের অধিবাসীরা মন্ত্রের প্রাণহীন বাঁধনে বাঁধা, তাহারা এক আচারসর্ব্বস্ব রাজ্যের অধিবাসী। তাহারা আচারবিলাসী, সত্যের ও ধর্ম্মের আরাধনা করিতে গিয়া তাহারা স্তূপীকৃত মিথ্যার আবর্জ্জনা সঞ্চয় করিয়াছে। তাহারা সকল প্রকার চঞ্চলতা হইতে নিজদিগকে মুক্ত রাখার জন্য যত্নবান্,—নিজদিগকে কঠোর কর্ত্তব্যের বাঁধনে বাঁধিয়া, নানারূপ মন্ত্রতন্ত্রের জালে নিজদিগকে জড়াইয়া, তাহারা অনিত্য

সংসারের মায়া কাটাইবে বলিয়া মনে করিয়াছে। স্বভাবের আনন্দরূপটি উহাদের কাছে অজ্ঞাত। তাই 'একজটা দেবী'র বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া ইহারা বিচিত্র দৃশ্য গন্ধ গানের আধার প্রকৃতি হইতে নিজেদের রাখিয়াছে বিচ্ছিন্ন করিয়া।

মন্ত্রের ও নিয়মতন্ত্রের রাজ্যে মানুষেব চিত্ত অসাড়, মানুষ সেখানে জড়ধর্ম্মী। সেখানে একদিকে মন্ত্রতন্ত্রের শাসনে মানুষ রক্তবিহীন পাণ্ডুর হইয়া যাইতেছে শীতের সাদা কুয়াসার মতো, অন্যদিকে সেই অচলায়তনেই ধ্বনিত হইয়াছে গান। মন্ত্রের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নিয়োজিত হইয়াছে গান। অচলায়তনের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে পণ্ড করিয়া দিয়া নাটকখানির গানগুলি সেখানে আনন্দময় খাপছাড়া ভোলানাথের আবির্ভাবের পথকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। তাবপর হঠাৎ কোনো খবর না দিয়া সাতসমুদ্রপারের রাজকুমারের মত গুরু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তখন সেখানে সাজানো তাস, বাঁধা কাজ বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে প্রত্যহের অতীত আনন্দের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

নাটকখানির মধ্যে পঞ্চকের গানগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা তাৎপর্য্যপূর্ণ। সুরই পঞ্চকের প্রাণকে অবসাদবিহীন নবীন রাখিয়াছে।

অচলায়তন নাটকের আরম্ভই গান দিয়া। পঞ্চক সীমার গণ্ডিতে আবদ্ধ মানবাত্মার প্রতীক। তাহার দৃষ্টি স্বচ্ছ, অনুভূতি বাধাহীন। বিশ্বের অন্তর্নিহিত সুর তাহাকে আকুল করিয়া তোলে। তাহার চিত্ত অসীমের জন্য উৎকণ্ঠিত। অসীম

তাহাকে সীমার সঙ্কীর্ণ গণ্ডি, মন্ত্রতন্ত্র ও নিয়মের গণ্ডি অতিক্রম করিবার আহ্বান জানায়। সে আহ্বান পৌঁছায় তাহার অনুভূতিলোকে এবং তখন অসীমের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায় সে গাহিয়া উঠে—

তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না,
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে
কেউ তা মানে না।
ফিরি আমি উদাস প্রাণে,
তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতন এমন টানে কেউ তো টানে না।

প্রারম্ভের এই গানের মধ্য দিয়াই একেবারে নাটকের মর্ম্ম-বাণীটি যেন আমাদের কাছে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। গণ্ডির মধ্য হইতে ব্যাপ্তির দিকে যাত্রার আকুতি নাটকের প্রারম্ভেই সূচিত হইয়াছে। রুদ্ধ জীবন হইতে বাহির হইয়া পড়িবার প্রেরণা অচলায়তনের রাজ্যে পঞ্চকের মধ্য দিয়াই প্রথম জাগিয়াছে।

মহাপঞ্চক রুদ্ধ ঘরের দেবালয়ের কোণে অবিচলিত নিষ্ঠায় সাধনার প্রয়াসী। তাঁহার নিকট জগৎ মায়া, অনিত্য। মন্ত্রের সোপান বাহিয়া তিনি সত্যে পৌঁছিতে চাহেন। তাই পঞ্চকের গান তাঁহার ভালো লাগে না। পঞ্চকের গানে তিনি আপত্তি তোলেন। পঞ্চকের গানই যে একদিন মন্ত্র ও নিয়মাচারের রাজ্যের শিশুগুলাকে আনন্দে মাতাইবে, মন্ত্রের বন্ধন ছিন্ন

করিবার শক্তি তাহাদের মধ্যে সঞ্চার করিবে, এ আশঙ্কা তাঁহার মনের মধ্যে জাগে।

পঞ্চক আকাশ বাতাস প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে চিররহস্যময়ের আভাস পায়। তাহার স্বচ্ছ অনুভূতিতে সে চোখে দেখার অতীত অরূপের সন্ধান পাইয়া গাহিয়া উঠে—

আকাশে কার ব্যাকুলতা
বাতাস কহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা
কেউ তো জানে না॥

মন্ত্রের নিগড়ে পঞ্চকের চিত্ত বাঁধা পড়ে নাই, তাই সে গান গাহিয়াছে। মনোহরণ কালোর বাঁশী. অকূলের আহ্বান তাহাকে কূল খোয়ানোর গান শুনাইয়াছে। তখন সঙ্কীর্ণ সীমার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তাহার কাঙাল পরাণ এক 'অচিন পুরে' পাড়ি দিবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছে,—অজানা অপরিচিতের সহিত মিলিত হইবার আকুতি তাহার মধ্যে জাগিয়াছে।

অরূপবীণার সুর ভ্রমরের গুঞ্জনের মধ্য দিয়া পঞ্চকের চিত্তকে স্পর্শ করিয়া তাহার মনে ঝঙ্কার তুলিয়াছে। ভ্রমরের গুঞ্জন তাহাকে জলস্থল আকাশের নিগূঢ় কথা শুনাইয়াছে, দিগন্তরালের নীলাভ সুদূরতার কথা শুনাইয়া তাহার মধ্যে অসীমের সহিত সাযুজ্যলাভের বাসনা জাগাইয়াছে। তখন আর ঘরে থাকাই তাহার দায় হইয়াছে।

পঞ্চকের গানে আপনাকে বাহিরে মেলিবার ব্যাকুলতা। সে অকূলের সাগর-পারের যাত্রী। প্রকৃতির চঞ্চলতার সহিত

সে তাল রাখিয়া চলিতে চায়। তাই তাহার মুখে আমরা গান শুনি, আর মহাপঞ্চক প্রভৃতি যাঁহারা নিয়মনিগড়ে বাঁধা তাঁহারা কেবল মন্ত্র আবৃত্তি করেন।

ফাল্গুনী নাটকেও দেখা যায় যে, দাদার নিকট কর্ত্তব্যই প্রধান, আনন্দ নয়। তাই সময়ের সদ্ব্যবহার, বিশ্বহিত প্রভৃতির সারবাক্য চৌপদীতে গাঁথিয়া তিনি সকলকে শুনাইয়া বেড়াইয়াছেন,—কিন্তু চঞ্চল শিশুদল গানে মাতিয়াছে। সুরেব বাহনে তাহারা সত্যলোকে, সুন্দবের বাজ্যে পৌছিয়াছে।

ভগবানের কাছে কবির প্রার্থনা—

তোমার কাছে এ বর মাগি
মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুবে ॥

পঞ্চকেব গান, দাদাঠাকুরের গান অসাড়, মুমূর্ষু অচলায়তনের মনেব ভিতে নাড়া দিয়াছে। অচলায়তন নাটকের গানগুলি মুক্তিব আনন্দচাঞ্চল্য জাগাইয়াছে। মন্ত্র অচলায়তনের অধিবাসীদেব বাঁধিতে চাহিয়াছে, গান তাহাদিগকে মুক্তির বাণী শুনাইয়াছে। নাটকের গানগুলি আমাদিগকে বিধিনিষেধের গণ্ডি হইতে অনেক দূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, আমাদের চিত্তকে এক পরিপূর্ণ চিরসুন্দরেব রাজ্যের অভিমুখী করিয়া তোলে।